শাস্ত্রসার।

—:o:—

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

রাণীগঞ্জ ধন্বন্তরি প্রেসে

শ্রীসারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ-পত্র।

—:০:—

পরমারাধ্য পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীকরকমলেষু।

দেব!

পুত্রের প্রতি পিতার যে কতদূর ভালবাসা, পিতা যে পুত্রের কতদূর মঙ্গলাকাঙ্খী, আমি, স্বল্পদিন মাত্র পুত্রের পিতা হইয়া, স্বল্পদিন পুত্রের লালন পালন করিয়া, পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, পিতার সেই ভালবাসা, সেই মঙ্গল কামনা, পূর্ণরূপে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি। পিতার স্নেহের বিনিময়ে, পিতার আশীর্ব্বাদের প্রতিদানে, কোন কর্ম্ম করিবার পুত্রের আদৌ যোগ্যতা নাই। পুত্রের কর্ত্তব্য, প্রত্যেক প্রিয়ানুষ্ঠান, প্রত্যেক প্রিয়সামগ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনার ন্যায় পিতৃদেব-প্রীতিউদ্দেশে সঙ্কল্পিত করিতে হয়। দেব, আমি আমার এই আদরের ও প্রাণের তৃপ্তিকর 'শাস্ত্রসার' গ্রন্থ আপনার তেজোময় স্নেহমাখা জীবন্ত মূর্ত্তির শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম, ইতি।

গোপালপুর।
১২ কার্ত্তিক।
সন ১৩১৪ সাল।

নিয়ত আশীর্ব্বাদপ্রার্থী—
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সূচনা।

—০—

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনদেশ, স্বর্ণপ্রসূ সর্ব্ববিধ ভোগসুখের আবাস-ভূমি, মানব ও দেবতার তপস্যাস্থান, ভারতে আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ভুবন-বিখ্যাত, আর্য্যধর্ম্ম মনুষ্য জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, সেই ভারতভূমি এখন ও বর্ত্তমান. সেই ভারতের আর্য্যজাতি আজিও বিদ্যমান, আর্য্যধর্ম্মের এখনও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতভূমি এখন আর ভারতের আর্য্যজাতির পক্ষে রত্নভূমি, সুখভূমি নাই। ভারতের আর্য্যজাতি এখন আর জগতের শ্রেষ্ঠজাতি নয়, জগতের শীর্ষস্থানীয় ও নমস্য নয়, আর্য্যধর্ম্ম এখন আর সমগ্র মানবজাতির নিকট শ্রেষ্ঠধর্ম্ম নয়, সমগ্র মানবের আদরণীয় আচরণীয় নয়, ভারতের স্থান মাহাত্ম্য এখনও লুপ্ত হয় নাই, যতদিন ভারতের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন স্থান মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবার নয়, পরন্তু ভারতের আর্য্যজাতির আর সে বিদ্যা, বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য, সামর্থ্য পরাক্রম ও প্রভাব নাই; যেন সমস্ত সদ্‌গুণ শ্রেষ্ঠগুণ বিলুপ্ত, অপ্রকাশিত, অন্তরনিহিত। আর্য্যধর্ম্ম নির্ব্বীর্য্য মলীন, এরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ কি! ভারতের পরিচিত বর্ত্তমান আর্য্যজাতি উত্তর করিবেন---যুগমাহাত্ম্য, কালপ্রভাব, কলির অধিকার; একালে ভারতের আর্য্যজাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইবে, আর্য্যধর্ম্ম বিনষ্ট প্রায় হইবে, জিজ্ঞাসা,—মানব সমাজ, মনুষ্যধর্ম্ম মনুষ্যের দোষে নষ্ট না হইয়া শুদ্ধ কালের দোষে নষ্ট হইয়া গেল! কালের সঙ্গে মনুষ্যের এই মাত্র সম্বন্ধ দেখিতে পাই, কাল আপন ভাবে নিরূপিত আদেশে নিত্য একভাবে চলিতে থাকে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ভাল মন্দ, ইচ্ছা অনিচ্ছা কোন বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে না, কাহাকেও কখন কিছু বলে না, কাহারও কখন কোন কথা শুনে না, তাই কাল নিত্য, কালের গতি অপরিবর্ত্তনীয়।

যুগ মাহাত্ম্য, কাল প্রভাব, কলির অধিকার শুদ্ধ ভারতের জন্য, এই কথা শুনিলে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়, হৃদয় অবিশ্বাসী হয়, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ হয়, ঈশ্বর পক্ষ-পাতী হন, শাস্ত্র সঙ্কীর্ণ হয়। সমগ্র মানবের স্রষ্টা নিয়ন্তা এক, মানবের ধর্ম্ম এক, মানবের শাস্ত্র এক, উপাস্য এক। ইতর প্রাণী ও মনুষ্যে প্রভেদ, ইতর প্রাণী

স্বভাবিক বা সাধারণ নিয়মাধীন, সাধারণ বৃত্তি সম্পন্ন, মনুষ্য স্বাভাবিক বৃত্তির, সাধারণ নিয়মের প্রতিপালনে ও পরিচালনে স্বাধীন ভাবে সক্ষম, তজ্জন্যই মনুষ্যের ভাষা, পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, সমাজ ও নিয়মাদিতে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য, মনুষ্যের স্রষ্টা নয়, মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তিরও সৃষ্টিকর্ত্তা নয়, তবে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কি উদ্দেশ্যে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে, কি গুণে মনুষ্য প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠজীব, মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি, মনুষ্যের আরাধ্য কে, মনুষ্য এই সকলের বিচার মীমাংসায় সক্ষম। মনুষ্য জগতের উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য, উপাস্য কখনও পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে না, যে শক্তি বা নিয়ম দ্বারা মনুষ্যের উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়, কর্ত্তব্য সাধিত হয় ও উপাস্য প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই মানবের সাধারণ বা সনাতন ধর্ম্ম, সুতরাং এক। প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্যজাতি মানবের সেই সাধারণ ধর্ম্মের আবিষ্কার, প্রচার, আলোচনা ও অভ্যাসে সমর্থ ও সিদ্ধ ছিলেন, তাই ভারতের আর্য্যজাতি জগতের শ্রেষ্ঠজাতি, আর্য্যঋষি অভ্রান্ত, ত্রিকালজ্ঞ, আর্য্যধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম যতদিন ভারতে আর্য্যজাতি স্বধর্ম্ম সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন, ততদিন তাঁহারা জগতের নমস্য ছিলেন ও ততদিন ভারত স্বাধীন, পুণ্যধাম, দেবতার বিচরণ ও বিহার ভূমি, দেবতার লীলাক্ষেত্র ছিল। আর্য্যজাতির স্বধর্ম্মাশ্রয়, কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও অহঙ্কার জন্মিতে থাকিলে, ক্রমে আর্য্যজাতির আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে লাগিল, সুতরাং ধর্ম্মও মলিনতা প্রাপ্ত হইল। আর্য্যজাতির চিত্তচাঞ্চল্য, মনোমালিন্য, দেহদৌর্ব্বল্য ঘটিতে থাকিলে ধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতাহেতু সমাজশৃঙ্খলও নষ্ট হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, ভারত পরাধীন হইল, বিধর্ম্মী বিজাতীয় রাজার অধিকারে চির প্রতিষ্ঠিত আর্য্যধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইল, আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে অধিকতর নিস্তেজ, ক্ষমতাহীন, সঙ্কীর্ণহৃদয়, স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বার্থপর হইয়া উঠিলেন, বহুকালের অধীনতানিবন্ধন উদারচেতা জগদ্ধিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মানব শ্রেষ্ঠ ভারতের আর্য্যজাতির জাতীয়তা, সমাজ ও ধর্ম্ম একেবারে বিশৃঙ্খল সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও মলিন হইয়া গেল, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। চরিত্র, কর্ম্মজীবন ও দৃষ্টান্ত অদৃশ্য হইল, আর্য্যজাতির উন্নত জীবন শুদ্ধ মুখে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ, রহস্য ও অনুশীলন, চরিত্রগত, কর্ম্মগত এবং অনুভবসিদ্ধ ঘুচিয়া গিয়া কেবলমাত্র গ্রন্থগত থাকিল, অতীত গৌরব ও অতীতকীর্ত্তি বজায় রাখিবার উপায় কেবল উপদেশপূর্ণ গ্রন্থপ্রচারে পরিণত হইল, গ্রন্থবিস্তার হইলে অনন্ত শাস্ত্র হইল, ব্যক্তিগত প্রশংসালাভের বাসনা

ক্রমে বলবতী হইল, অসংখ্য শাস্ত্রের অসংখ্য মত প্রতিপন্ন হইল, অবশেষে আত্ম বঞ্চনা ও লোকপ্রতারণা হৃদয় অধিকার করিল, বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত ভেদরহিত অদ্বৈত পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রচারিত হইল, জগন্মঙ্গলবিধাতা সদাশিবের ও জগদ্ধাত্রী শক্তির শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়া বিঘোষিত হইল, যাবতীয় শাস্ত্র অভ্রান্ত, ত্রিকালজ্ঞ, ঋষিবাক্য বলিয়া প্রচারিত হইল; গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থশ্রবণের ফলশ্রুতি রচিত হইলে উপায় উদ্দেশ্যে পরিণত হইল, গ্রন্থই দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন, ফলে অধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম গুহা আশ্রয় করিলেন, অসত্যের বিস্তারমাহাত্ম্যে সত্য অপ্রকাশিত হইল, শাস্ত্র অনন্ত, অসংখ্যপথপ্রদর্শক মহা জটিল, দুর্গম ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িল; তাই বহুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মপুত্র সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশী শরীরী বকরূপী ধর্ম্মের "পন্থা কি এবং ধর্ম্ম কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া বড়ই আক্ষেপে বলিয়া ছিলেন "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্, ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ, স পন্থা।" অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সত্য ঈশ্বরের বাক্য হইলেও মানবের চিত্তদৌর্ব্বল্যে ও স্বার্থপরতায় বিভিন্নমতপ্রতিপাদক হইয়া পড়িয়াছে। স্মৃতি, যদ্দ্বারা মানব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উপদিষ্ট ও সক্ষম হয়, ঈশ্বরাদেশে নিয়মিত শৃঙ্খলা রাখিতে সমর্থ হয়, সেই স্মৃতি মানবের কর্তৃত্বাভিমানে জড়িত হইয়া বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিতেছে, বেদের নাম শ্রুতি অর্থাৎ ভগবান যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করা এবং স্মৃতি অর্থে সেই উপদেশ স্মরণ করা, সুতরাং এই দুই শাস্ত্রে মানুষের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই বা মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই, যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিহীন এবং স্থিরবুদ্ধি অথবা যিনি সংলীনমানস অর্থাৎ যাহার মন ভগবানে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর হন এইরূপ ব্যক্তিকে শাস্ত্রে মুনিপদ-বাচ্য করিয়াছেন সুতরাং মুনি দিগের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মতভেদ থাকিতে পারেনা, সাধারণ মনুষ্যের বিভিন্ন বুদ্ধির নিকটে মুনিমত ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অগত্যাই বলিতে হয় শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয় সুকঠিন এবং মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত পথ, মহাজন অর্থে যিনি বেদের ও স্মৃতির যথার্থ রহস্যবেত্তা বা মুনিলক্ষণান্বিত, অতএব শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া ঐরূপ মহাজনের শরণাপন্ন হও, কাজেই এই শাস্ত্রবিপর্য্যয়ের সূচনা বহুকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; তবে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বোক্ত উত্তরে বুঝা যায়, যেন তখন শাস্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটিলেও আদর্শ পুরুষের বা

মহাজনের অভাব ঘটিত না, বর্ত্তমান সময়ে মহাজনেরও পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে এবং সেই অভাব ঘটিবার একমাত্র কারণ ভারতের অধীনতাশৃঙ্খল, ধর্ম্মপরায়ণ সত্য সেবী, সাধক সিদ্ধের পালনকারী, রক্ষাকারী এবং পূজাকারী আর্য্যরাজা বহু দিবস পূর্ব্বে ভারতে অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই জন্যই ভারতের উপস্থিত সময় দুঃসময়, অবস্থা বড় শোচনীয়; আর এক কথাও বলিতে হয়, যদি কেহ এমন প্রশ্ন করেন, যুধিষ্টিরের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সুতরাং তখন ধর্ম্মের অবস্থা, শাস্ত্রের দশা মন্দ হইবে কেন? কিন্তু যে শাস্ত্রে যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, সেই শাস্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তি "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" যখন যে যুগে যে সময়ে ভগবানের অবতারের আবশ্যক হয়, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সাধুদিগের যন্ত্রণা ও অসাধুর অত্যাচার স্বতঃসিদ্ধ সংঘটন। আগে শাস্ত্রমর্য্যাদালঙ্ঘনে ধর্ম্মগ্লানি না ঘটিলে, অসাধু কর্ত্তৃক সাধু দিগের নিগ্রহ না হইলে, ভগবানের প্রাণে আঘাত লাগে না, জীবের উদ্ধার জন্য জীব সাজিয়া জীবের পরিত্রাণ করিতে, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে ভগবানের অবতার হয় না। কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর কি কলি সকল যুগেই সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্মদোষে, বুদ্ধিদোষে ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্ম বিস্তার ঘটিয়া থাকে! সেই জন্যই ভগবানের বহুবার অবতীর্ণ হইবার আবশ্যক হয়। সৃষ্টজীব ভগবানের, জীব উৎপথগামী হইলে ভগবানের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই দয়াময় উৎপথগামী জীবের দশা মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই বলি, যতই ভারতের দুর্দ্দিন হউক না কেন, যতই ভারতে ধর্ম্মপ্রচারক আর্য্যঋষির অভাব থাকুক না কেন, আর্য্যধর্ম্মপ্রতি-পালক রাজার অভাব ঘটুক না কেন, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপক ভক্তরক্ষক ভগ-বানের ত অভাব ঘটিবার নয়। সুখের অন্তে দুঃখ ও দুঃখের অন্তে সুখ চির প্রসিদ্ধি, শাস্ত্রের এত বিপর্য্যয় সত্বেও আর্য্যধর্ম্মের, আর্য্যজাতির নাম এখন ও বিলুপ্ত হয় নাই। এখন ও স্মৃতি একেবারে ধ্বংস হয় নাই, এখন ও অতীত গৌরবের স্থানে স্থানে স্মৃতিচিহ্ন জীবন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এখনও সনাতন ধর্ম্মের জাগ্রতমূর্ত্তি কত কত সাধু মহাত্মা নদী পর্ব্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যথিত হৃদয়ে আর্য্যভূমির, আর্য্যজাতির, আর্য্যধর্ম্মের দুরবস্থা ভগবানকে নিত্য নিবেদন করিতেছেন; ঊর্দ্ধদৃষ্টে ভগবানের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছেন। এখনও স্মৃতি জাগাইয়া কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ভারতের আর্য্যজাতি প্রাচীন গৌরব

জগতে কীর্ত্তন করিতে, প্রচার করিতে একেবারে বিরত হন নাই, এখন ও জগতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে অনেক আর্য্যসন্তান জীবন সঙ্কল্প করিতেছেন কিন্তু অদ্যাপি ও কৃতকার্য্য না হইবার কারণ—ভারতের জন্য, জগতের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যথার্থ রহস্য, পূর্ণ সত্য বর্ত্তমান কোন আর্য্য সন্তানের হৃদয়ে বিকশিত প্রকাশিত হয় নাই। সত্যপূর্ণ হৃদয়ে আর্য্যসন্তান কেহ আর্য্যমাহাত্ম্য, আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যশাস্ত্র জগতে প্রচার করিতে প্রয়াসী ও অগ্রসর হন নাই।

সত্য চিরসত্য, খণ্ডিত হইবার নয়। বহুকাল ধরিয়া আর্য্যচরিত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া, নানাবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণ পাঠ করিয়া, ধর্ম্মের সারোদ্ধার ও রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হই নাই, সনাতনধর্ম্ম খুঁজিয়া পাই নাই, শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতি বুঝিতে পারি নাই, অনেক পণ্ডিত, ধর্ম্ম প্রচারক, পরিচিত সাধু সন্ন্যাসীর মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রাণে তৃপ্তি পাই নাই, বহুবর্ষ কাটিয়া গিয়াছে, উত্তরোত্তর উন্নতি না দেখিয়া যেন অবনতি মনে করিয়াছি, সৎকার্য্যের বহু বিঘ্ন দেখিয়াছি, সাধু চরিত্রের বিপরীত শক্র প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, তথাপি প্রাণের আকাঙ্খা, চির উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় নাই। কাতর হইয়া, সঙ্কল্প করিয়াও যেন সে আকাঙ্খা একেবারে ত্যাগ করিতে পারি নাই। হঠাৎ কাঁহার আশীর্ব্বাদে, কাঁহার কৃপায়, কোন্ পুণ্যে, দৈব প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া যেন দেখিতে পাইলাম, আর্য্যশাস্ত্রসাগরে সনাতন ধর্ম্ম নিমজ্জিত রহিয়াছে, উদ্ধারও বড় সহজ, সহজেই সংগ্রহ করিলাম, অন্বেষিত বস্তুলাভে প্রাণে অপরিমিত আনন্দ জন্মিল, জগতে সমভাবে বিতরণ করিতে প্রবৃত্তি ও সংকল্প আসিল, এবং বর্ত্তমান সময়ে জগতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের সহজ পন্থা ও সর্ব্ব জন্মের অনায়াসলভ্য ধর্ম্মরহস্য গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলাম। জানি, জগতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রচারকেরা অগ্রে নিজ নিজ জীবন্ত চরিত্র দেখাইয়া নিজ নিজ মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বহু লোকের আদর্শ হইয়া পূজিত হইয়াছেন, দৃষ্টান্ত না দেখিলে শুদ্ধ উপদেশে কাহারও প্রাণে তৃপ্তি বা বিশ্বাস জন্মে না, তবে গ্রন্থাকারে ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়াস কেন? কি গুণে লোকে বিশ্বাস করিয়া, আদর করিয়া গ্রহণ করিবে? তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি—আমার নিজের চরিত্রের এমন কোন বিশেষত্ব নাই যে কাহারও আদর্শ হই, নিজের এমন কোন স্বাধীন মত নাই যে, কোন মত খণ্ডন করিয়া নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু আমার বিশ্বাস ও ভরসা এই, আমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি তাহাতে আমার

যোগ্যতার বিশেষত্বের কোন আবশ্যক নাই এবং মূলে ও অন্তরে কোন নীচ স্বার্থ সংযোজিত নাই। সংগৃহীত সামগ্রী সাধারণে বিতরণ করিতে যে সে সক্ষম; অধিকন্তু সামগ্রী যদি উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, মহোপকারী, সুখসেব্য ও আনন্দ দায়ক হয়, তবে আদর করিয়া কে না গ্রহণ করিবে। অনেকেই গ্রহণ করিবেন, যে হৃদয়ে সদসদের বিচার আছে, ভাল মন্দের তারতম্য আছে, মঙ্গল অমঙ্গলের অনুভূতি আছে এমন হৃদয়ে নিশ্চয়ই স্থান পাইবে, আদর পাইবে এবং একবারে হৃদয়ে স্থান পাইলেই চরিত্রগঠন সহজ ও সুখসাধ্য হইবে। আবার, বিচার বিহীন, মোহান্ধ, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি বহু লোকের নিকট অনাদৃত, অগ্রাহ্য হইলেও বিশুদ্ধ সত্য অসত্যে পরিণত হইবে না, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টত্ব পাইবে না, নমস্য ঘৃণিত হইবে না, উত্তম অধম হইবে না। এক্ষণে ভগবৎকৃপায়, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে, দৈবপ্রেরণায় যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, সমগ্র আর্য্য জগতে আমার এই প্রার্থনা, এই ভিক্ষা যেন তাঁহাদের কৃপায়, তাঁহাদের কল্যাণে আমার ব্রত সুসম্পন্ন হয় এবং শেষ বক্তব্য যদি আমার নিজদোষে বা কোন অপবিত্রতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য বশতঃ সত্যের অঙ্গে কোন স্থানে কখন অসত্যচিহ্ন লক্ষিত হয়, সত্যই তাহা মুছিয়া লইবেন, সত্যসেবী সাধু চরিত্রে সত্যই প্রত্যক্ষ হইবে, গ্রন্থের কোন স্থানে ভ্রম বিরোধ সংযুক্ত হইলে সত্যসেবী আর্য্যগণ যথাকালে তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবেন—কিমধিকমিতি।

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

মানব-সৃষ্টি

আর্য্যশাস্ত্রে পরমেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য জন্য নিজ মূর্ত্তিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা মূর্ত্তিতে সৃষ্টি, বিষ্ণু মূর্ত্তিতে পালন, এবং রুদ্র মূর্ত্তিতে সংহার করিয়া থাকেন, এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি মানস সৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তার ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যসৃষ্টিকালীন ব্রহ্মার ইচ্ছা এইরূপ ভাবে আর্য্যশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে যেন তিনি প্রথম হইতেই শ্রেণী বিভাগ করিয়া মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানবসৃষ্টি ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি হইলেও মনুষ্যের উৎপত্তি স্থান বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। যাবতীয় জড় ও প্রাণী জগতেরই সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু কোন পদার্থের, অপর কোন প্রাণীর উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ না করিয়া শুদ্ধ মানবের উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশ করিবার কারণ কি এবং শ্রেণীবিভাগ করিয়াই বা মনুষ্যকে সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্য কি? কৈ, অপর কোন প্রাণীরই ত এরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া আদিসৃষ্টির বর্ণনা নাই। এক শ্রেণীর মনুষ্য হইলে সৃষ্টির কি অঙ্গহানি হইত? ভারতের মনুষ্য মধ্যেই ত শ্রেণীবিভাগ, বর্ণানুসারে কর্ম্ম ব্যবস্থা। অপর দেশে ঐরূপ বর্ণ বিভাগ কর্ম্মের ব্যবস্থা না থাকায় সে দেশের মনুষ্যের বা মনুষ্য সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে? যদি বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, তবে বর্ণ বিভাগ ঈশ্বরকৃত বলিবার হেতু কি? ঈশ্বরকৃত হইলে জগতের যাবতীয় মানবসমাজে বর্ণ বিভাগ থাকিল না কেন? বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা ও কল্পনা করিতে পারা যায় না। এক্ষণে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে প্রথমে দেখাযাক্, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যে মনুষ্যসৃষ্টিকালীন

পৃথক্ পৃথক্ গুণ বিশিষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন ও তাঁহাদের বর্ণানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিলেন, আর্য্যশাস্ত্রের এই উক্তির সত্যতা বা তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টিকর্ত্তার রূপ, অস্তিত্ব, কার্য্য সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কল্পনা করিয়া চিন্তা করিয়াও প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, সেই জন্যই পরিদৃশ্যমান জগৎ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, গ্রহ নক্ষত্র, ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ, ব্যোম সমস্ত সৃষ্টিকর্ত্তার রূপ বা দেহাংশ বলিয়া বর্ণিত হয়। সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দৃশ্যমান যাবতীয় জগৎ, প্রাণী ও পদার্থ, রূপ বলিলেই ঈশ্বরের স্বরূপপরিচয় যথার্থ বা পর্য্যাপ্ত হয় না। এই জগৎ ছাড়া যে আর কোন দ্বিতীয় বা অধিক জগৎ নাই তারই বা প্রমাণ কি? সে জগতে যে অপর কোন শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জীব থাকিতে পারে না তারই বা হেতু কি? পরন্তু শাস্ত্রে অসংখ্য লোক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের অংশাংশের ও যথার্থ পরিচয় কি না সন্দেহ তবে একাংশ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কেন না ভগবানের সত্তা বা শক্তিবিবর্জ্জিত কিছুই হইতে বা থাকিতে পারে না ('বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ইতি গীতা)। এবম্বিধ পরমেশ্বরের স্বরূপচিন্তা, স্বরূপদর্শণের লালসা মনুষ্য হৃদয়ে জাগরিত হইলে মানুষ কোন্ রূপে তাঁহার স্বরূপচিন্তা করিবে, কোন্ পরিমিত প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে ভগবানের ধ্যানারম্ভ করিয়া তাঁহার অনন্ত অলৌকিক দিব্য বিরাট ব্রহ্ম মূর্ত্তির স্বরূপদর্শণে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইবে, তজ্জন্য দয়াময় ভগবান মানবের প্রতি দয়া করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মানুষ রূপই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সেই জন্যই মানুষ দেহ ধারণ করিয়া ভগবান বা ভগবৎজনের অবতার প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, তাই মানুষ হইয়া মানুষকে অনাদর বা নিকৃষ্ট বোধ না করিয়া আদর ও উৎকৃষ্ট বোধ করিবে এবং তাহার দৃষ্টান্তও জগতে এখনও জলন্ত জীবন্ত নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখনও মানুষ মানুষের শিক্ষাদাতা, মানুষ মানুষের অধিপতি, মানুষ মানুষের উপাস্য ও ইষ্টদেবতা, মনুষ্য হৃদয়ে ভগবানের বিশেষ স্থান, মানুষ দেহে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, মনুষ্য ইতর প্রাণীর ন্যায় সমভাবে, স্বাধীন ভাবে প্রাকৃত গুণ দ্বারা চলিত বা রক্ষিত নয়; ইতর প্রাণীর ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মের বা পদার্থের সম্পূর্ণ অধীন নয়; সাধারণ ভাবে ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেকাংশে সম্পূর্ণ পরাধীন। একজন মনুষ্য আপনার আহার বিহার বাসস্থান পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় পদার্থের বা বিষয়ের একাই কোন সংস্থান বা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না, অন্যের সাহায্যে বা আশ্রয়

একান্তই লইতে হয়। শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া বাসের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, জলপান বা ব্যবহার জন্য পুষ্করিণী কূপ খনন করিতে হইবে, সচ্ছন্দে যাতায়াত জন্য রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে, কৃষিকার্য্য করিয়া আহারের সংস্থান করিতে হইবে, বল বিক্রম দেখাইয়া সর্ব্ববিধ আপদ্ হিংসা ও শত্রু হইতে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে, প্রাকৃতিক পদার্থের গুণকার্য্যপর্য্যালোচনা ও বিচার মীমাংসা করিয়া পণ্ডিত হইতে হইবে এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মলাভ করিতে হইবে ইত্যাদি মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংগ্রহ বা অনুষ্ঠান যদি একাই কোন মনুষ্যকে করিতে হয়, তবে কাহারও দ্বারা কখনও ঐ সকল কার্য্যসম্পাদন সম্ভবে কি? কখনই না, না কি তাহা হইলে মনুষ্যজীবন মনুষ্যের মত থাকিতে পারে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই পরমকারুণিক পরমেশ্বর প্রথম হইতেই মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আদি মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সৃষ্টিকথা শুনিলে সন্দেহ আপত্তি বিচার ও বিস্ময়ের হেতু কি? সৃষ্টিতে বৈষম্য বা পার্থক্যই প্রধান লক্ষণ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির কোন পার্থক্যে সন্দেহ আপত্তি না ঘটিয়া এক মানুষের পার্থক্যে এত বিবাদ বিস্ময় কিসের জন্য? কেহ হয়ত বলিবেন আকারগত সদৃশ এক প্রাণীর বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন বৃত্তি কেন হইবে? কোন প্রাণীতেইত সৃষ্টি কর্ত্তার এরূপ ব্যবস্থা নাই, তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য,—মনুষ্য অপেক্ষা কোন উন্নত প্রাণী কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? এবং তাহাদের সমান গুণ সমান বৃত্তি দেখিয়াই কি এরূপ সন্দেহ বিচার জন্মিয়াছে? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই আকারগত একরূপ সমগ্র মানবজগতে বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন কর্ম্ম আছে বলিয়াই মানব ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ; ইতর প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে এবং মানুষ হইয়া মানুষের উপর রাজত্ব করিতেছে। মনুষ্য দেবত্বে ব্রহ্মত্বে আকাঙ্খা করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। নচেৎ ইতরপ্রাণীর ন্যায় সমানধর্ম্মাবলম্বী হইলে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু এতদিন মানবসৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইত অথবা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া সিংহের পশুরাজত্বে মানবও প্রজাভুক্ত হইত। মানুষ, মানুষের ভিতর গুণবৃত্তির স্বাভাবিক তারতম্য দেখিয়াই, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, প্রভু দাস, দাতা ভিখারী, প্রভৃতি অবস্থানভেদ দেখিয়াই উন্নত হইবার সঙ্কল্প ও সাধন শিক্ষা করিয়াছে এবং দেবত্বে উন্নীত ও ভগবানে মিলিত

হইয়াছে। বর্ত্তমান মানবজগতে যেমন রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, ধনী দরিদ্র, দাতা ভিখারী প্রভৃতির প্রভুত্ব নীচত্ব সুখ দুঃখের তারতম্য উঠাইয়া দিয়া সকলের সাম্যবস্থা সমাভাব সংস্থাপন করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ও পূর্ব্বোক্ত তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে যেমন মানুষের নিজ নিজ কর্ম্মফল বা পূর্ব্বজন্মের তপস্যার সিদ্ধান্ত করিতে হয় তদ্রূপ মানবের আদিসৃষ্টিতে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ বিভাগ সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত ও নির্দ্দিষ্ট বুঝিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে হয় এবং সৃষ্টির আদি হইতে মনুষ্যমধ্যে গুণকর্ম্মের ও বর্ণের তারতম্য আছে বলিয়াই চিরকাল সৃষ্টি পরম্পরায় নিত্য নিয়ত তারতম্য লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য জন্মের এই অপার সৌভাগ্য যে মনুষ্য, মনুষ্য হইয়াছে এবং এই জন্যই ভগবান্‌কে দয়াময় বলিয়া প্রাণে এত আনন্দ, সৃষ্টি ভগবানের, প্রীতি তাঁর, সৃষ্টপ্রাণীর জন্ম জীবন ও সংহারের কর্ত্তা তিনিই, এবং সৃষ্টিস্থিতিসংহারে ইচ্ছা অনিচ্ছা, ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য অনুরাগ বিরাগ ভগবানই বলিতে পারেন, সে বিষয়ে মানুষের আন্দোলন আলোচনা বিচার মীমাংসা পণ্ডশ্রম বর্ব্বরতা পাপচিন্তা, ভগবান মানুষকে যতটুকু বিচার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন মানুষ তাহাতে সক্ষম হইলেই ধন্য ও ভগবানের প্রিয়, বস্তুতঃ ইহা সত্য হইলেও মানবের সৌভাগ্য এই যে বিধাতা মানব সৃষ্টিকরিয়া, মানবকে প্রাণীজগতে রাজা করিয়া যেন বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন, সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার সৃষ্টিতে থাকিয়া তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতে মানবকে উপদেশ দিয়াছেন, মানব ভগবদাদেশে ভগবৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইলে দেহান্তে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যহৃদয়ে ভগবান নিত্য প্রতিবিম্বিত, নিয়ত বর্ত্তমান, তাই মনুষ্য আত্মানুসন্ধানে ভগবানে মিলিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায় যদি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ তাঁহার পৃথক পৃথক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছার উপর বাদানুবাদ কেন? এবং তাহা শুনিলেই বা মানবের অস্থিরতা কেন! পরন্তু বিচারবুদ্ধিতে বুঝিতে হইলে যখন মানবের মধ্যে গুণরুচির স্বাভাবিক তারতম্য নিত্যই দেখিতে পাই তখন সেই গুণরুচির পার্থক্য স্রোতের প্রবাহ আদিসৃষ্টি হইতে চলিয়া আসিতেছে বুঝিতে হইবে। ইতর প্রাণীর সাধারণগুণ ও মনুষ্যের গুণপার্থক্য ইহাই ইতর প্রাণী ও মনুষ্য জগতের স্বাভাবিক লক্ষণ। ভগবান্ আদি হইতে চারিশ্রেণীর মনুষ্য সৃষ্টি না করিলে তাঁহার মনুষ্যসৃষ্টি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে এবং মানবসৃষ্টি রক্ষাহেতু মানবের

শ্রেণীবিভাগ মনুষ্য কৃত হইলে বিধাতার উপর মানবের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ভগবানের স্থূলদেহ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে দেহের উর্দ্ধার্দ্ধ মুখ ও বাহুরূপী এবং বৈশ্য শূদ্রকে দেহের নিম্নার্দ্ধ উরু ও পদরূপী ধরিয়া লইতে হয়, মনুষ্যদেহে মুখ বাহু উরু পদ চারি অঙ্গের ন্যায় মানবজগতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের একত্র সন্নিবেশ একত্র মিলন তুল্যরূপে উপযোগী, শরীরের মধ্যে যেমন চরণ উরু বাহু ও মুখ এই চারি অঙ্গের কোন একটির অভাব ঘটিলে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় তদ্রূপ মনুষ্যসমাজে ব্রাহ্মণাদি চারি অঙ্গের কোন অঙ্গহানি হইলে সমাজ বা মিলন নষ্ট হইয়া যায়, মানব উচ্ছৃঙ্খল, অসহায় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য যেন সৃষ্টিকর্ত্তার অঙ্গে আঘাত লাগে, অন্তরে যাতনা হয়, অথবা দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত প্রভৃতির সমষ্টীভূত বিরাটদেহধারী ভগবানের দেহে যেন সত্য সত্যই ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ মুখ বাহু উরু ও পদরূপে অবস্থিত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়া যেন মানবের গৌরব দেখাইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া মানবের উৎপত্তি স্থান বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও নিজ দেহের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম হইতেই শ্রেণীবিভাগ করিয়া মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে সকল দেশের মনুষ্যমধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকিল না কেন? এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে সৃষ্টির আদিতে বিশেষ কোন স্থানের মনুষ্য বলিয়া মনুষ্যসৃষ্টি হয় নাই এবং বিশেষ কোন মহাদেশ দেশ নির্দ্দেশ করিয়া মনুষ্যবাসের আদেশ হয় নাই; মহাদেশদেশবিভাগ মনুষ্যকৃত ও নামকরণ ও মনুষ্যকৃত, কেননা রাজা ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ ইত্যাদি সুতরাং বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন আহার ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ দেখিয়া আদিসৃষ্টির সিদ্ধান্ত করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সমাজের মনুষ্যমধ্যে কোন সাধারণমিলন আছে কি না। যে দেশের যে জাতিই হউক না কেন যেখানেই মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে, মিলন রাখিতে সক্ষম হইয়াছে সেই খানেই আদিসৃষ্টির চারি শ্রেণীবিভাগ প্রকারান্তরে বর্ত্তমান; এখনও উন্নতশীল কোন জাতির সমাজে দাসত্বজীবী শ্রমজীবী না থাকিলে এক মুহূর্ত্ত চলে না, কৃষক বণিক না থাকিলে অন্নধনের সংস্থান হয় না, বলশালী যোদ্ধাপুরুষ না থাকিলে দেশ ও মনুষ্য সমাজ রক্ষিত হয় না, শাসন বা নিয়ম প্রতিষ্ঠিত থাকে না, শিক্ষক গুরু পুরো-

ছিত্তের আবশ্যক অপরিহার্য্য, মানুষ শত শত দেশে বাস করিয়া, শত শত জাতিতে বিভক্ত হইয়া, শত শত সমাজভুক্ত হইয়া, শতধা স্বতন্ত্র হইয়াও যেন প্রাকৃতগুণকর্ম্মের প্রকারভেদে বর্ণবিভাগের স্মৃতি একেবারে ভুলিতে পারে নাই তাই নামভেদে আকারভেদে বর্ণভেদের মূর্ত্তি জীবন্ত রাখিয়াছে, যাহা সাধারণ তাহাই প্রাকৃত, ভগবানের বিধান। ইহাতেও যদি কেহ বলেন বর্ণ বিভাগ ও পৃথক পৃথক কর্ম্ম মনুষ্য কৃত, মনুষ্য নিজের সুবিধার জন্য সমাজবন্ধনের জন্য ইচ্ছা করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ও পৃথক পৃথক কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণের তারতম্য ঘুচাইয়া সমান গুণবিশিষ্ট মনুষ্যের বিভিন্নরুচি কি প্রকারে সম্ভবপর হয়! মনুষ্যের সম্ভব অসম্ভব ন্যায় অন্যায় যা তা প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। ইচ্ছা করিয়া উত্তম অধম হইতে, রাজা ভিখারী হইতে, পূজনীয় ঘৃণিত হইতে, মাণী তিরস্কৃত হইতে সম্মত হন না, প্রবৃত্তির অনুকূলেই সকলেই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। ইতিহাস পুরাণে যদিও মহতের সাময়িক নীচকার্য্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কোন সাময়িক কর্ম্মবিপাক বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি ভিন্ন আজীবন কার্য্যানুষ্ঠান ও নীচত্বে পরিণতির পরিচায়ক নয়, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে আত্মবিক্রয় করিয়া ছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপগৃহে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালদাসত্ব আজীবন থাকিল না কর্ম্মবিপাক ঘুচিয়াগেল হরিশ্চন্দ্র আবার রাজা হইলেন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গোপগৃহে বৃন্দাবন-লীলা সম্পূর্ণ করিয়া উপনয়নকাল সমাগত দেখিয়াই পিতা বসুদেবগৃহে প্রত্যাগত হইলেন, ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং চারিবর্ণের ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশসাধন করিয়া নিত্যধাম সত্যলোকে প্রত্যাগত হইলেন। ভারতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উচ্চজাতি যে এক্ষণে অনেকে স্বধর্ম্ম স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য কৃষি ও বণিক বৃত্তি এবং দাসবৃত্তি চাকুরী করিতেছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কি স্বাভাবিক উচ্চবৃত্তির মনে মনে পোষণ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষায় সক্ষম হইয়াছেন! জীবিকাবৃত্তির অনুরূপই বুদ্ধি বৃত্তি ঘটিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে শরীরের দ্বারা যাহাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে মন উন্নতই রাখাযায় এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কেন না শরীর ও মনের কার্য্যতঃ নিত্যসম্বন্ধ, তবে যাঁহারা সাধনা ও সিদ্ধিপ্রভাবে শরীর মনের অতীত আত্মভূত হইতে পারেন রাজর্ষি জনকের মত জীবন্মুক্ত ও

চৈতন্যসমাধিস্থ থাকেন শরীর মনের নির্লিপ্ত কার্য্য তাঁহাদেরই চরিত্রে সম্ভব, তদ্ভিন্ন সাধারণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নয়। গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণ-বিভাগ ঈশ্বর কৃত হইলেও আবার স্বতন্ত্র প্রশ্নের অবতারণা হয়, স্বতন্ত্র দায়িত্বের আবশ্যক হয় যথা, চারি শ্রেণীর মনুষ্য হইতে অসংখ্য শ্রেণী অসংখ্য জাতি কি প্রকারে সমুত্থিত হইল, পৃথক পৃথক ভাষা কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইল, পৃথক পৃথক আচার ব্যবহার শাস্ত্র উপাসনা কি প্রকারে সংঘটিত হইল। এবং মূলে যদি চারিবর্ণই বিধাতা নির্দ্দিষ্ট হয় ও মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও উপাসা এক হয়, তবে সমগ্র মানব কেন অসংখ্য জাতীয়তা ঘুচাইয়া চারি বর্ণরে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না, কেন এক ভাষার অধীনে এক শাস্ত্রের বিধানে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে না। এই সকল প্রশ্নের ও দায়িত্বের বিচার মীমাংসার পূর্ব্বে কেবল মাত্র স্মরণ রাখিতে হইবে মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, স্বাভাবিক গুণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, ঈশ্বরনিরূপিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং মনুষ্যজগতের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-মিলন অতিক্রম করিয়াই বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, বর্ত্তমান ভাবে চালিত হইতেছে এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট স্বকর্ম্মচ্যুত হইয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বর হারাইয়া ঘোর যন্ত্রণা ও অহরহঃ অশান্তি ভোগ করিতেছে, মানুষ মানুষের জন্য লালায়িত হইবে, মানুষ মানুষ দেখিলে আনন্দিত হইবে, মানুষ মানুষের ভিতর সমবেদনা ও প্রীতি অনুভব করিবে, তাহা না হইয়া মানুষ মানুষের ভয়ে ভীত, মানুষ মানুষ দেখিলে চমকিত, দেশ রাজত্ব সম্পত্তি প্রভুত্ব অভিমান আত্মীয় পর ইত্যাদির ভাবনায় মানুষ নিত্য ব্যতিব্যস্ত, নিত্য বিবাদ-পরায়ণ, ঈর্ষা হিংসা পরশ্রীকাতরতা নিয়ত মানুষের ভিতর বর্ত্তমান, মুহূর্ত্তেক জন্য মানুষের চিত্ত যেন উদ্বেগশূন্য প্রশান্ত নয়। মানব! ঐ সকল ভাব পোষণ জন্য ঐরূপ কর্ম্মের আচরণ জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নাই! শ্বাপদ্ হিংস্র বিষধর বলিয়া তোমার সংজ্ঞা হয় নাই! তাইবলি সমগ্র মানবজগতের বর্ত্তমান আকার বর্ত্তমান আচরণ নিজদোষে অধঃপতন এবং তাই বর্ত্তমান কাল মানব জগতে অধর্ম্মপ্রভ কলিকাল, মানবজগতে কবে আবার সৃষ্টিকর্ত্তার চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইবে, কবে আবার সমগ্র মানব ঈশ্বরা-দেশে কর্ত্তব্য জ্ঞানে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের আচরণ করিবে এক সমাজের অধীন হইবে, এক শাস্ত্রের বিধানে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এই আকাঙ্খার সিদ্ধি দেখিতে হইলে শুধু মুখে আন্দোলন তর্ক বিবাদ করিলে চলিবে না, কল্পনায় ভাষায় সমন্বয় করিলেই হইবে না, আর্য্যজাতির কৃষ্ণ, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট, বৌদ্ধের বুদ্ধ,

মুসলমানের মহম্মদ শুধু কথায় মিলাইয়া দিলে হইবে না, তদ্রূপ আবার আর্য্য জাতির গুরু পুরোহিত, খ্রীষ্টানের পাদরী মিসনারী, মুসলমানের হাফিজ মৌলবি মুখে এক করিলেই হইবে না, যে গুণে যে সাধনে মানুষের মিলনের প্রবৃত্তি জাগরিত ও বর্দ্ধিত হয়, যে সিদ্ধিতে মিলন সাধিত ও রক্ষিত হয় তদনুযায়ী গুণের অর্জ্জন ও কর্ম্মের সাধন এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে সিদ্ধি বা ফলপ্রাপ্তি আপনা আপনি ঘটিবে; ক্রমে আবার মানুষ ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল বিশুদ্ধ হইবে, আবার চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইবে এক শাস্ত্রের অবতারণা ও এক ঈশ্বরের উপাসনা হইবে; আবার ধর্ম্মপ্রভ সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, আবার মনুষ্য কুৎসিৎ সঙ্কল্প ও কুকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া, যন্ত্রণাউদ্বেগ অশান্তি বিরহিত হইয়া সত্যসঙ্কল্প তপোরত ও প্রশান্ত হইবে। এক্ষণে বর্ত্তমান মানবের এই ক্রমোন্নতির কথা শুনিয়া কেহ যেন কালের বা সময়ের বিচার চিন্তায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করেন, কেন না কতকাল পরে আবার সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, কতকালে কলির অবসান হইবে, কতকালে মানুষ বিশুদ্ধ নির্ম্মল সত্যপরায়ণ হইবে ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা উত্তর মনের তৃপ্তিবোধক অনুমান হইলেও জীবনের কর্ত্তব্যনির্ণায়ক চরিত্রসাধক হইতে পারে না, পরিমিত পরমায়ুবিশিষ্ট মানবের পক্ষে দুইশত বৎসর পরের ঘটনা আর দুইলক্ষ বৎসরান্তের ঘটনা তুল্যফলদায়ক যেহেতু বর্ত্তমান জীবন কোনটিই প্রত্যক্ষ করিবে না। মানুষ যে মূহূর্ত্তে আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে, গন্তব্যপথ দেখিতে পাইবে এবং স্বধর্ম্ম চিনিতে পারিবে কালের অপেক্ষায় কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে গন্তব্যপথে ও স্বধর্ম্মপালনে অগ্রসর হইবে, আদর্শ-জীবন একবার রাখিয়া যাইতে পারিলে জীবনান্তেও অমরজীবন লাভ হইয়া থাকে, আজ কোটি কোটি মনুষ্যের জীবনান্ত হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই তাহাদের নাম স্মৃতি বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু স্মরণাতীত নির্ণয়াতীত কতকালের ধ্রুব, প্রহ্লাদ ব্যাস বাল্মীকির নাম জগতে জাগ্রত জীবন্ত রহিয়াছে, সৃষ্টিজগতে কাল নিত্য, কালকে আয়ত্ত করিবার, কালের গতিতে হস্তক্ষেপ করিবার মনুষ্যের ক্ষমতা নাই; মনুষ্যকে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যেন তাহার জীবনকাল অকার্য্যে অতি-বাহিত না হয় বরং কালের কথা ভাবিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হয় :—

"জীবন যদ্যপি হয় অবসান আপন করম লাগি,
কিম্বা ক্ষতি তায় অন্য জন্মে হবে করম রবেনা বাকি॥"

গুণভেদে—বর্ণবিভাগ ও কর্ম্মব্যবস্থা

ভাষাভেদ—জাতিবিভাগ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট ও তাঁহাদের পৃথক পৃথক কর্ম্ম বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণ ত্রিবিধ,—সত্ত্ব, রজ, তম, (উত্তম, মধ্যম, অধম)। কার্য্যতঃ সত্ত্বগুণ মঙ্গলকারক, রজগুণ মঙ্গল অমঙ্গল উভয়ের প্রবর্ত্তক এবং তম অমঙ্গলকারক; সত্ত্ব শমতাকারক, রজ উত্তেজক এবং তম অবসাদক; সত্ত্বগুণ ইন্দ্রিয়গণের সৎপ্রবৃত্তিবিধায়ক ও সংযমসাধক, রজগুণ ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহায়তাকারক এবং তমগুণ ইন্দ্রিয় বৃত্তির শৈথিল্যকারক, যে গুণ সৃষ্টির সাহায্য করে তাহা রজগুণ, যাহা পালনে সহায়তা করে তাহা সত্ত্ব এবং যাহা ধ্বংসের নিমিত্ত হয়, তাহা তমগুণ। কামনা, সকামকর্ম্ম ও কর্ম্মে প্রবৃত্তি রজগুণ জাত, কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান সাত্ত্বিক এবং কর্ম্মে অনিচ্ছা বা আলস্য তমগুণের কার্য্য, জ্ঞান ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভালবাসা দয়া স্নেহ পরোপকার স্বার্থত্যাগ অহিংসা সত্ত্বগুণ জাত, কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার অভিমান, বল বিক্রম হিংসা, স্বার্থ কার্য্যকুশলতা রজগুণের কার্য্য। অজ্ঞান আলস্য অনিচ্ছা প্রমাদ মোহ তমগুণের কার্য্য। সত্ত্বের বর্ণ শুভ্র, রজ রক্তবর্ণ, এবং তম কৃষ্ণবর্ণ (বর্ণাভাব)। গুণের এবম্বিধ তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতর উক্ত ত্রিবিধ গুণই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান এবং মনুষ্যজীবনে তিন গুণের কার্য্যই অল্পাধিক পরিমাণে একান্ত আবশ্যক, জাগরণ চৈতন্যের ন্যায় নিদ্রারও তুল্য প্রয়োজন। চতুর্ব্বর্ণ মানবের ভিতর গুণের তারতম্যে ব্রাহ্মণে সত্ত্বগুণের আধিক্য, ক্ষত্রিয়ে রজগুণের আধিক্য, বৈশ্যে রজতমগুণের আধিক্য এবং শূদ্রে তমগুণের আধিক্য লক্ষিত হয়; এবং গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের স্বাভাবিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা,—"শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি-রার্জবমেবচ, জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ শৌর্য্যং তেজোধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ কৃষি গোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥" (গীতা) এই স্বভাবজ কর্ম্ম হইতেই ক্রমে চারিবর্ণের সামাজিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহণ এই ষড়বিধ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—প্রজাপালন দান, অধ্যয়ন যজ্ঞ গীত-নৃত্য ও নিয়ত স্ত্রীসম্ভোগ এবং বৈশ্যের কর্ম্ম পশুপালন, দান যজ্ঞ অধ্যয়ন, স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং কুসীদগ্রহণ ও শূদ্রের

ক্ষত্র অসূয়াবিহীণ হইয়া বর্ণত্রয়ের সেবাকরা। মনুষ্যশরীরে চরণ উরু বাহু ও মুখের ন্যায় মানবসমাজে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণাদির উত্তরোত্তর উর্দ্ধাবস্থিতি ও অধিক যোগ্যতা দেখান হইয়াছে। চরণ অভাবে শরীরে যে পরিমাণে ক্ষতি, উরুর অভাবে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি এবং বাহুর অভাবে অধিকতর ও মুখের অভাবে শরীরের সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়, শরীর একেবারে অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে কেননা মুখ শরীরের আহার দ্বার, আহার অভাবে শরীরের পুষ্টি ও কর্ম্মক্ষমতা থাকিতে পারে না তদ্রুপ ব্রাহ্মণের অভাবে মানবসমাজ একেবারে শিথিল ও অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে, ব্রাহ্মণের যাবতীয় স্বাভাবিক, ও সামাজিক কর্ম্ম কর্ত্তব্যজ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে জগতের ও মানবের কল্যাণ সাধনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই জন্যই ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের শ্রেষ্ঠ ও বর্ণত্রয়ের দেবতা স্বরূপ, আবার শরীরে মুখ বাহুর যদ্রুপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বাহু নিত্য মুখে আহার তুলিয়া দেয়, তদ্রুপ ক্ষত্রিয় নিত্য ব্রাহ্মণের পালন ও রক্ষা বিধান করে। আজ ভারতে সেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিত্যসম্বন্ধ নিত্যকর্ত্তব্য ঘুচিয়া গিয়াই আর্য্যসমাজ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়াছে, বর্ণধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যারপরনাই অধঃপতন হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের স্বাভাবিক গুণ, স্বাভাবিক কর্ম্ম ও তদনুযায়ী সামাজিক কর্ম্মদৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পারাযায় যেন মানবজগতে সমাজসংগঠনের আবশ্যক বুঝিয়া, মিলন রাখিবার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ভগবান মানবের প্রতি দয়া করিয়াই প্রথম হইতে বর্ণানুসারে গুণানুসারে কর্ম্মব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং স্বধর্ম্মশ্রেয়ে স্বকর্ম্মসাধনে মানবের সিদ্ধিলাভ বিধান করিয়া ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" এক্ষণে মানবজগতে ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখাযায় প্রাণীজগতে শব্দ প্রাকৃত, নিত্য, ভাব-প্রকাশক ভাষা সাধারণভাবে সকল মনুষ্যই ব্যক্ত ও উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং দেশভেদে ভাষাভেদ থাকিলে ও বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত উন্নত মনুষ্য সকলেই ভাষার সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে সুতরাং ভাষাভেদে মনুষ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি আপত্তি হইবার কারণ নাই, তবে সমগ্র মানবের একভাষা হইলেই যেন অধিকতর সুবিধা বোধ হয়। প্রথম কি প্রকারে ভাষার সৃষ্টি হইল ইহার আলোচনা করিতে হইলে, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পাই তাহাদেরও সাধারণ মনোভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি বা শব্দ ও সঙ্কেত আছে; মনুষ্যের বিশেষত্ব সেই মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষা, সেই

ভাষার উৎপত্তির প্রথম কারণ, যেদিন আদি মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তার ভাষা শুনিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্কেত বুঝিলেন, ঈশ্বরাদেশে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা আপন ভাষায়, আপন ভাবে যেরূপ কৌশলে আদিমনুষ্যকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিলেন, সেই দিন হইতে মনুষ্য ভগবদনুকরণে আপন ভাবে কথাকহিতে, কৌশলে আপনার মনোভাব অপরকে বুঝাইতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট হইল; ইচ্ছার ও চেষ্টার পরিণাম ভাষার উৎপত্তি হইল, সুতরাং ভাষা মনুষ্যকৃত হইল। তজ্জন্যই ভগবান মনুষ্যের পৃথক পৃথক ভাষা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই পরন্তু সংস্কৃত দেবভাষা বলিবার কারণ, ভারতে যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ও মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে। সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতার অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ কৌশলে সাধারণ নিয়মে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে যেন বিধাতাকে আর নিত্য নূতন সৃষ্টি করিতে হয়না, সৃষ্টি যেন সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কিছুতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যাহা সাধারণ তাহাই প্রাকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনুষ্যের ভাষা সম্বন্ধে প্রাকৃত নিয়ম এই—মনুষ্যের মনোভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি আছে ও যাহাতে নিজভাব অপরকে বুঝাইতে পারে মানুষের ভিতর তাহার কৌশল বা বুদ্ধি আছে। সেই মনোভাব ব্যক্তকারক শব্দ ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সাহায্যে মানুষ ভাষা রচনায় সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবান মানবের বর্ত্তমান ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা নন, তবে আদিমানবকে অগ্রে ভাষা শিক্ষা না করাইয়া ভগবান কি প্রকারে কর্ম্মশিক্ষা করাইলেন ইহা সহজে বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যেমন ইতর প্রাণী হইতে উন্নতজীব মানব, পশু পক্ষীকে কৌশলে কর্ম্মশিক্ষা করাইতে সক্ষম হয় ও মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ ডাক বা কথাও পশু পক্ষী বুঝিতে পারে অথবা মূক বধিরকেও যখন ইঙ্গিতে সঙ্কেতে কর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ত্তাও আদি মনুষ্যকে তাঁহার কথা বা ভাব বুঝাইয়া ছিলেন ও তাঁহার আদেশমত কার্য্যকরণে সমর্থ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে আদি চতুর্ব্বর্ণ হইতে কি প্রকারে অসংখ্য বর্ণের, অসংখ্য জাতির উদ্ভব হইল, আদি মনুষ্যের এক ভাষা হইতে কি প্রকারে অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হইল ও বর্ণচতুষ্টয়ের স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইতে কি প্রকারে অসংখ্য কর্ম্মজাল বিস্তার হইল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে ভগবান মানবকে এতাদৃশ উন্নতজীব করিয়াও কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণসমন্বিত করিয়াছেন এবং ত্রিগুণাত্মক

উত্তম মধ্যম অধম কার্য্য হেতু মানবের ত্রিবিধ গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ গীতা)। স্বষ্টমানব ভগবানের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেও গুণকর্ম্মের অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাধীনতা সংযোজিত হইয়াছে, তজ্জন্যই কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মের ফলসংযোগ বিষয়ে মনুষ্যের নিজের দায়িত্ব (ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥)। আদি-বর্ণের আদিদম্পতি সৃষ্টি করিয়া ভগবান আদেশ করিলেন "তোমরা আমার আদেশে, আমার প্রীতি উদ্দেশে, কর্ত্তব্য বোধে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে থাক এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনে মৈথুন কার্য্যদ্বারা সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া আমার সৃষ্টি-সংবর্দ্ধন করিও, দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে"। আদিবর্ণের আদিদম্পতি হইতে ক্রমে অসংখ্য মানব বিস্তার হইল, মৈথুনসৃষ্টিপরম্পরায় ক্রমে অধস্তন মানবের চিত্তবিভ্রম ঘটিল, মানুষ ভগবদাদেশ ভুলিয়া গিয়া ভগবানের সৃষ্টিতে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান করিতে লাগিল, মানুষ, মানুষের জন্মদাতা সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিয়া অহঙ্কার করিল এবং মৈথুনকার্য্য সৃষ্টিসংবর্দ্ধনজন্য ভুলিয়া গিয়া ইন্দ্রিয়প্রীতি বুঝিল। সবর্ণাস্ত্রীতে নিরূপিত কালের প্রতীক্ষা না করিয়া যথেচ্ছামতে অসবর্ণা-স্ত্রীতে অকালে উপগত হইতে লাগিল, ক্রমে অসংখ্য বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল, এবং বর্ণসঙ্করত্ব হেতু স্বাভাবিক বুদ্ধিও মিশ্রিত বা বিকৃতবুদ্ধি হইয়া গেল, স্বাভাবিক কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে লাগিল এবং নিরূপিত সমাজের অধীন ঘুচিয়া ইচ্ছামত সমাজবদ্ধ হইতে লাগিল এবং সঙ্করত্ব-হেতু স্বভাববিকার ও সর্ব্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্যাভিমান ঘটিলে আর এক সমাজ, এক ভাষা ও নিরূপিত কর্ম্মের অধীন থাকিতে প্রবৃত্তি রহিলনা, ক্রমে আচার ব্যবহার রীতি নীতি ভাষা পরিচ্ছদ ও আহারাদি সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। এক শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া মানব কল্পিত শাস্ত্রের অধীন হইয়া গেল এবং এক ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা করিতে লাগিল, পতিত মানব অসংখ্য কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বর হারাইয়া পাপী ও অহরহঃ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইল, তাই এক্ষণে সাধারণ মানব নিত্য ইহকাল ও পর-কালের ভাবনায়, পাপপুণ্য স্বর্গ নরকের চিত্রে, মৃত্যুর বিভীষিকায় বড়ই কাতর, দেহের পরিণাম মুক্তির উপায় বুঝিতে অক্ষম।

ধর্ম্ম।

সমগ্র মানবজগতে, সকল দেশে সকল জাতিমধ্যে সকলেই ধর্ম্মের কথা কহিয়া থাকে। সংসারের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের ন্যায় ধর্ম্মেরও যেন কতই না অবিশ্যক। ধর্ম্মের ভাবনায় অনেকেই কাতর, যেন ধর্ম্ম না হইলেই নয়; আবার অনেকে তাহাদের ধর্ম্ম কি, এই মীমাংসার জন্যও বড় ব্যাকুল। ধর্ম্ম যেন মনুষ্যের কতইনা সুহৃদ, কতইনা প্রিয়সামগ্রী, যেন ধর্ম্মের সঙ্গ হারাইয়া লোকে বড়ই কাতর, অথবা ধর্ম্মের সঙ্গলাভজন্য প্রাণের যেন বড়ই ব্যাকুলতা। কিন্তু ধর্ম্ম কি! কেন মানুষ ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হয়, ধর্ম্মের অভাবে মানুষের কি ক্ষতি? মানুষের ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিবার কোন্ প্রয়োজন? ধর্ম্ম থাকিলেই বা মানুষের কি উপকার? ধর্ম্মের জন্য মানুষের আন্দোলন ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হয়, ধর্ম্ম যেন মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা হাসা রোদনের ন্যায় স্বাভাবিক কোন বৃত্তিবিশেষ, সহজ আকাঙ্খার আবশ্যকীয় বস্তু, যেন ধর্ম্মের উদ্রেক স্বাভাবিক। ধর্ম্মরাজ্য বড়ই বিস্তৃত। ধর্ম্মের জন্য কত কত অবতার, কত কত প্রচারক, শত শত শাস্ত্র গ্রন্থ, তথাপি ধর্ম্ম কি, ইহার যেন কোন স্থির মীমাংসা নাই। শাস্ত্রের মতভেদ, প্রচারকের মতভেদ, সম্প্রদায়ের মতভেদ, ধর্ম্মের রহস্যভেদ করা বড়ই কঠিন। ধর্ম্মের সহজবোধগম্য সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশের উপায় নাই। ধর্ম্ম ভাবিতে গেলে, ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে বুদ্ধিশক্তিতে কুলাইয়া উঠেনা, শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়, ধর্ম্ম বুঝিয়া উঠা সাধারণ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটিবার নয়। যিনি মহা ভাগ্যবান, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিশালী তিনিই ধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম, অথবা ভগবানের দয়া নাহইলে ধর্ম্ম বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং ঈশ্বর ও ঈশ্বর লাভের ন্যায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যের সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি সামর্থ্য ও চরিত্রের আয়ত্তাধীন নয়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর যেন একই, অথচ কোথাও কোন শাস্ত্রে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন নাই। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এবং "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিলে ধর্ম্মের আচরণ করা দূরে থাকুক ধর্ম্ম বুঝিবারই উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রণোদিত করিতেছেন এবং যুদ্ধকরা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম দেখাইয়াছেন, যদিও তাহাকে অসংখ্য নরহত্যা তথাপি ধর্ম্ম। দ্বিতীয় শ্লোকে মনে হয়, যেন বিদ্যা বা অর্থোপার্জ্জন কালীন

ধৰ্ম্মের আচরণ হয়না অথবা ধৰ্ম্মের আচরণ করিতে গেলে বিদ্যা অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারেনা; বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জনকালীন শরীরের ব্যাধি জরা বা মৃত্যুর বিষয়ও ভাবিবার যো নাই, ভাবিলেই যেন বিদ্যা ও অর্থলাভে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, শরীর থাকিলেই ব্যাধি জরা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ভাবিতে হইবে যেন শরীর ব্যাধি-জরামৃত্যুপরিশূন্য, এবং ধৰ্ম্ম আচরণ করিতে হইলেও তদ্রূপ ভাবিতে হইবে, মৃত্যুর আসন্নকাল এমনকি মৃত্যু আসিয়া যেন মস্তকের কেশে ধরিয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু মৃত্যু আসিয়া কেশে ধরিয়াছে এই ভাবনা যদি কাহারও কোন মুহূর্ত্তে মনে হয় তবে তৎক্ষণাৎ শরীরের দ্বারা কোন কার্য্য করার কথা দূরে থাকুক, দেহের প্রতি উদাসীন ও মমতাশূন্য হয়, দেহের পরিণাম ছাইভস্মের দৃশ্য সম্মুখে দেখিতে থাকে। এই শেষোক্ত ধৰ্ম্ম ও অর্জ্জুনের ধৰ্ম্ম নিশ্চয়ই এক ধৰ্ম্ম নয়। অর্জ্জুনের ধৰ্ম্ম কর্ত্তব্য পালনে, দ্বিতীয় ধৰ্ম্ম কর্ত্তব্যত্যাগে। এইরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধবাক্যে কিম্বা বাক্যের সামঞ্জস্য অভাবে ধৰ্ম্মসম্বন্ধে মনুষ্যের মস্তিষ্ক বড়ই বিচলিত হইয়া যায়, কি বুঝিবে কিছুই ঠিক নাই। যাহা হউক ধৰ্ম্মসম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে ধৰ্ম্ম বলিলে সাধারণতঃ কি বুঝায়, জড়ের ধৰ্ম্ম ও ইতর প্রাণীর ধৰ্ম্ম বলিতে আমরা তাহাদের প্রকৃতি বুঝি, যেমন অগ্নির ধৰ্ম্ম বা প্রকৃতি বা স্বভাব দাহ, জলের শৈত্য, শ্বাপদের হিংসা ইত্যাদি। মনুষ্যের ঐরূপ কোন ধৰ্ম্ম বা স্বভাব আছে কি না এবং যেমন জড়ের জড়ত্ব, পশুর পশুত্ব, তদ্রূপ মানুষেরও মনুষ্যত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সেই মনুষ্যত্ব কি? ইতর প্রাণীর তুলনায় মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তি "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। জ্ঞানং নরাণাং অধিকং বিশেষো জ্ঞানেন-হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥" ইতর প্রাণীর ন্যায় আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন মনুষ্যের ও আছে, মনুষ্যের বিশেষত্ব জ্ঞান, এক্ষণে জ্ঞান কি? জ্ঞানের সাধারণ অর্থ জানা, যেমন অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানা, জলকে জল বলিয়া জানা, সাপকে সাপ বলিয়া, বাঘকে বাঘ বলিয়া এবং মানুষকে মানুষ বলিয়া জানা ইত্যাদি; এইরূপ জ্ঞান ইতর প্রাণীরও আছে কিনা। ইতর প্রাণীর অগ্নিজ্ঞানে ও মনুষ্যের অগ্নিজ্ঞানে প্রভেদ, অগ্নি দেখিয়া ইতর প্রাণীর একরূপ স্বাভাবিক অগ্নি জ্ঞান হয়। কিন্তু অগ্নি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, কোথায় থাকে, কি প্রকারে দাহ করে, কেমন করিয়া জলে ও নির্ব্বাণ হয়, কখন উপকার কখন বা অপকার করে ইত্যাদি জ্ঞান ইতর প্রাণীর হইতে পারেনা, কিন্তু মনুষ্যের হইতে পারে। সুতরাং গুণাগুণ বিচার পরীক্ষায় যে অগ্নিজ্ঞান তাহাই মনুষ্যের অগ্নিজ্ঞান। এইরূপ পিতৃ

অপ তেজ মরুৎ ব্যোম গ্রহ নক্ষত্র পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিবী দিবা রাত্রি ঋতু অয়ন বৎসর ইত্যাদির বিচার পরীক্ষায় যে জ্ঞান তাহাই তৎতৎ পদার্থ বা পরমানুর, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর, সময় বা কালের যথার্থ জ্ঞান। তদ্রূপ আবার মনুষ্যজ্ঞান, মনুষ্যের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কি প্রকারে হয়, মনুষ্যের সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম কি? মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? ইত্যাদির বিচার মীমাংসা ও পরীক্ষাকে মনুষ্যজ্ঞান বলে, এই জ্ঞান যার নাই সে মনুষ্য পশু। আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীপুরুষের মিলনে মৈথুন ক্রিয়ায় শুক্রশোনিতের মিশ্রণে মনুষ্যের উৎপত্তি বা জন্ম হইয়া থাকে, বিনা স্ত্রীপুরুষের মিলনে বিনা মৈথুনে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতে পারেনা, জল বায়ু ও খাদ্যের সাহায্যে মনুষ্যের জীবন ধারণ, শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। অঙ্গ সঞ্চালন বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের কার্য্য বিষয়ে মনুষ্যদেহে বায়ুরই প্রাধান্য, শ্বাস প্রশ্বাসই মনুষ্যের জীবনের পরিচায়ক, শ্বাস প্রশ্বাসের একবার গতিরোধ হইয়া আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিলেই মৃত্যু অথবা যতক্ষণ দেহে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে ততক্ষণ মৃত্যু ঘটিতে পারেনা। মনুষ্যের জন্ম জীবন ও মৃত্যুতে মৈথুন আহার ও শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণের যে কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই, সেই কর্ত্তৃত্ব কোথা হইতে কি প্রকারে মনুষ্যদেহে সংঘটিত হয় এবং ঐ কর্ত্তৃত্বের উপরে মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব আছে কিনা? মৈথুনের সাহায্য ভিন্ন মনুষ্য জন্মিতে পারেনা, আহার না করিয়া জীবন থাকিতে পারেনা, শ্বাস প্রশ্বাস হীনদেহে ইন্দ্রিয় যন্ত্র কার্য্য করিতে পারেনা, মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে মৈথুনে মানুষের কর্ত্তৃত্ব কি। অতি শৈশবে মনুষ্য মৈথুন কার্য্যে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ, অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও তদ্রূপ, যৌবনাবধি বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত নিয়মিত কালে মানুষের মৈথুন কার্য্যে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য। স্ত্রীপুরুষে আবার মৈথুন করিলেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয়না, ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করিতে হইবে, আহারেও কোন রূপ স্বেচ্ছাচার করিবার উপায় নাই, অল্পাহার অতি ভোজন উভয়ই অনিষ্টকর, পরিমিত আহার চাই এবং শরীরের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপযোগী আহারের আবশ্যক। শ্বাস প্রশ্বাসেরও তদ্রূপ নিয়মিত গতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে জীবনে অনিষ্টসাধন হয়। সুতরাং মনুষ্যের জন্ম জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে মনুষ্যকে এক সাধারণ নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, কেহ তাহার বিপরীতাচরণ করিতে সক্ষম নয়, আবার নিয়মিত আচরণ করিলেও মনুষ্যদেহে বাল্য যৌবন জরা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহারও কেহ ব্যতিক্রম করিতে পারেনা। মনুষ্যের জন্ম জীবন মৃত্যু (সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ) যে সাধারণ নিয়মাধীন, মনুষ্য সেই নিয়মের প্রবর্ত্তক বা

কর্ত্তা নয়, মনুষ্য নিয়মের পালনকর্ত্তা। যে নিয়মাধীনে মনুষ্য জাত বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয় সেই নিয়ম প্রতিপালনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ বা স্বাভাবিক নিয়মপ্রতিপালন কাহারও পক্ষে কঠিন, দুঃসাধ্য নয় পরন্তু সহজ ও সুখকর। ইতর প্রাণীও নিজ নিজ ধর্ম্ম বা স্বাভাবিক নিয়ম পালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের নিয়ম পালনের বিচার বা জ্ঞান নাই। মনুষ্য স্বধর্ম্ম বা স্বাভাবিক নিয়মের বিচার পরায়ণ হইতে পারে। সৃষ্টি জগতে যাবতীয় প্রাণীরই উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ, ভগবানের ইচ্ছামাত্রে ঘটিয়া থাকে এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ত্রিবিধ কার্য্যেই ভগবানের সমান প্রীতি, তজ্জন্যই নিত্য একভাবে ঘটিয়া থাকে জন্ম জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে কোন প্রাণীরই নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই, যাবতীয় প্রাণীই সৃষ্টিকর্ত্তার ক্রীড়াসামগ্রী। মনুষ্য ভগবানের সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠজীব, জ্ঞান শক্তি সমন্বিত বলিয়া ইতর প্রাণীর উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, জগতে ভগবানের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে, মানুষ মানুষের দোষ গুণের বিচারকর্ত্তা, মানুষ মানুষের শাসনকর্ত্তা, শান্তিদাতা, মানুষ মানুষের পালনকর্ত্তা, মানুষ মানুষের রাজা, নদী-পর্ব্বত-বৃক্ষ-লতা-ওষধি-শস্য-ধন-রত্ন-সমন্বিত বসুন্ধরার অধিপতি মনুষ্য। এত আধিপত্য মনুষ্যকে ভগবান কেন দিয়াছেন, নিশ্চয়ই মানুষের এই আধিপত্যের যোগ্যতা আছে। ভগবান যেন সমস্ত কর্ত্তব্য, সমস্ত কার্য্যভার মনুষ্যের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, আর সেই কর্ত্তব্য কার্য্যভার চালাইবার জন্য মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়াছেন। মানুষ নিত্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী থাকিবে। ভগবান—ভগবান, মানুষ তাঁহার সৃষ্ট আজ্ঞাবহ জীব, ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ মানুষ অহরহঃ স্মরণ রাখিবে। মনুষ্য জীবজগতে, মনুষ্যজগতে ভগবানের ন্যায় নিত্য প্রীতি বিস্তার করিবে, যদ্রূপ ভগবান হইতে কখন কোন প্রাণীর ভয়, উদ্বেগ সম্ভব হয়না তদ্রূপ মনুষ্য, কখন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ভয় বা উদ্বেগের কারণ হইবেনা এবং প্রকৃত মনুষ্য হইয়াও কখন ইতর প্রাণী বা মনুষ্য হইতে ভয় বা উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবেনা, ইহাই যথার্থ মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যের বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম। যে মনুষ্য সর্ব্বদা সেই স্বধর্ম্ম সংরক্ষণে সমর্থ আর্য্যশাস্ত্রে তিনিই মুনিপদ বাচ্য হইয়াছেন এবং মুনিসেবিত অরণ্য, মুনিদিগের আশ্রম তজ্জন্যই সর্ব্বদা ঈর্ষা হিংসা-অশান্তি-পরিশূন্য যেন শান্তিরাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাই রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ ও বৈশ্যরত্ন সমাধি মেধামুনির আশ্রম দেখিয়া ছিলেন "প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতং" শ্বাপদের হিংসাবৃত্তি স্বাভাবিক কিন্তু সেই শ্বাপদ মেধামুনির আশ্রমে আসিয়া মুনির প্রীতি প্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

ঐরূপ মনুষ্যত্বলাভই জীবন্মুক্তি এবং তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষেই সহজসাধ্য, তজ্জন্যই ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণচরিত্র নিত্য ভগবৎচরিত্রের অনুকরণকারী, তাই ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য পাইলেও ব্রাহ্মণের নিকট নতশীর, বৈশ্য শূদ্রের আর কথা কি। এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ স্মরণ রাখিতে হইবে এবং বর্ণভেদে ধর্ম্মের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ঈশ্বর নিরূপিত বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম, ঈশ্বরাদেশে কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রতিপালন করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম ও সেই স্বধর্ম্মপালনই মনুষ্যের ক্রমোন্নতিসাধক ও মুক্তি-বিধায়ক। স্বধর্ম্ম পালনজন্য প্রত্যেক মনুষ্যকে নিত্য ধর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে। ধর্ম্মের চারিটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ—সত্য, শৌচ, দয়া, দান; এই চারিঅঙ্গ সমন্বিত ধর্ম্মমূর্ত্তিকে নিত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। মনুষ্য, সত্য, পবিত্রতা, জীবে দয়া ও জীবজগতে দান বা স্বার্থ বিসর্জ্জন নিত্য অভ্যাস করিবে, ইহাই মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। মানুষ যেবর্ণে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যে আশ্রমে অবস্থিত হউক না কেন, চারিপাদ সমন্বিত সাধারণ ধর্ম্মের আচরণে সমর্থ হইলে সহজেই ইহলোক পরলোক জয় করিতে পারে। সত্যের অভ্যাস করিতে হইলে ভগবান সত্য, ভগবানের কার্য্য সত্য, ভগবানের সৃষ্টি সত্য বুঝিতে হইবে। মানুষ নিত্য সেই সত্যের প্রকাশ ও অভ্যাস করিবে, মুখে সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে, অন্তরে সর্ব্বদা সত্য ভাবনা করিবে, সত্যকথা শ্রবণ করিবে, সত্যপথে সর্ব্বদা চলিতে থাকিবে ও অপরকে চালিত করিবে, প্রাণান্তেও সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না। শাস্ত্রে আপৎকালে প্রাণরক্ষা প্রভৃতি স্থলে অসত্য বলিতে যে অনুমোদন করিয়াছেন তাহা অসমর্থ পক্ষে সঙ্কীর্ণ উপদেশ ও সত্যের অপালন বুঝিতে হইবে, কেননা যাহার ধর্ম্ম বা সত্য অপেক্ষা প্রাণ, জীবিকা প্রিয় সামগ্রী তাহারই পক্ষে প্রাণাদি রক্ষা স্থলে সত্যের অপালন বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যচরিতে সত্যাসত্য উভয়ের বিদ্যমানতা ঘটিলে চরিত্র অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা-মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন দ্রোণাচার্য্য কি বলিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁহার প্রত্যয় হইলনা, কেননা তিনি সদসৎ সত্যমিথ্যা উভয়ের প্রবর্ত্তক; শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র সত্যপরায়ণ, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কদাচিৎ অসত্যের অবতারণা হইতে পারেনা, তাই আচার্য্য বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ! আমি জানি তুমি কে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি না সুতরাং তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা, সত্যবাদী রাজা যুধিষ্ঠির

আসিয়া যদি বলেন যে অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, তবে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি হইবে” শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইলেন, যুধিষ্ঠির সমীপে আসিয়া বলিলেন, রাজন ; তোমায় অশ্বত্থামার মৃত্যু কথা মিথ্যা করিয়া আচার্য্যকে জ্ঞাপন করিতে হইবে, সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলিতে হইবে শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন দ্রোণ অশ্বত্থামা শত্রুপক্ষ, শত্রুপক্ষের বিনাশ সাধন করিতে না পারিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, রাজ্য উদ্ধারের আশা নাই, শত্রুপক্ষের অনেক ত্রুটি দেখাইলেন অনেক অকার্য্য বুঝাইলেন, অনেক অধর্ম্ম দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির বড়ই বিপন্ন হইলেন, উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, একদিকে সত্য ত্যাগ, অপরদিকে স্বার্থ সিদ্ধির প্রলোভন, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অশ্বত্থামার মৃত্যুকথা বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের যাবতীয় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিথ্যাবলিতে অনুমোদন করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির কেমন করিয়াই বা শ্রীকৃষ্ণ বাক্য অবহেলা করেন, অথচ যে সত্য আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ লাভ ঘটিয়াছে সেই সত্যকেই বা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করেন, যুধিষ্ঠিরের বিষম পরীক্ষার দিন। স্বার্থের প্রলোভনে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিচারশূন্য হইল, সত্য ও শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের সামঞ্জস্যে হৃদয় অশক্ত হইল, শেষে প্রকারান্তরে অশ্বত্থামা নামক হস্তীর নিধনকথাচ্ছলে আচার্য্য সমীপে অশ্বত্থামার মৃত্যুকথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচক্রে দ্রোণাচার্য্য হত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যুধিষ্ঠির শত্রুনিপাত করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেন, পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য সমীপে অশ্বত্থামার মৃত্যুকথা বলার দিন হইতে মহাপ্রস্থানদিবস পর্য্যন্ত আর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে শান্তি আসিলনা, যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াও স্বর্গে নরক দর্শন করিলেন, মিথ্যার পরিণাম দেখিলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তখন আর শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুরূপী হইয়া নরক দর্শনে বাধা দিলেন না, পরন্তু যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করাইয়া মানবজগতে সত্যের আদর্শ দেখাইলেন এবং বুঝাইলেন “মানব! যতদিন তোমার দেহে আত্মাভিমান থাকিবে, যতদিন কায়মনোবাক্যে তোমার যাবতীয় কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে না পারিবে, যতদিন অন্তঃকরণ সুখদুঃখাতীত নিশ্চল অবস্থা লাভ না করিবে, ততদিন যেন মুহূর্ত্তের জন্যও কায়-মন-বাক্যে সত্য হইতে বিচলিত হইওনা” ইহাই সত্যশিক্ষা। যেমুখে নিত্য সত্যকথা কথিত হয় সেমুখ কদাচ মিথ্যা বলিতে সক্ষম হয়না অথবা সত্যমুখে যে কথা বাহির হয় তাহা কদাচ মিথ্যা হইতে পারেনা, যে মন সর্ব্বদা সত্যের চিন্তা করিতে থাকে সে মনে কদাচ মিথ্যার চিন্তা আসিতে বা প্রবেশ করিতে পারেনা অথবা সে মনে যাহা

চিহ্নিত হয় তাহা নিত্য সত্য বুঝিবে এবং যে শরীর সর্ব্বদা সত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে সে শরীর কখন মিথ্যা কার্য্য করিতে সক্ষম নয় অথবা সে শরীরের যাবতীয় কার্য্যই সত্যকার্য্য বুঝিবে, ইহারই নাম সত্যসিদ্ধি। শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা অভ্যাস করিতে হইবে, তদ্রূপ কায়মনবাক্যে পবিত্র থাকিতে হইবে, দেহের ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে ও মন প্রফুল্ল থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত স্বাস্থ্যকর সাত্বিক আহার করিতে হইবে (আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥ কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ॥ যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চযৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥ ইতি গীতা।) বিশুদ্ধ জল ব্যবহার ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস এবং এরূপ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে যেন গৃহের চারিদিকে বায়ুর অব্যাহত গতি হয় ও গৃহের উপর আকাশ উন্মুক্ত থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধহীন বস্ত্র ও শয্যা ব্যবহার করিতে হইবে। শুষ্ক প্রদেশে দুর্গন্ধহীন কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বালিত বিধেয়, বাসগৃহে অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, এরূপ দ্রব্যে আলো জ্বালিতে হইবে যেন আলো হইতে কোনপ্রকার দুর্গন্ধ অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নির্গত না হয়, এই জন্যই বিশুদ্ধ তৈল ও ঘৃতের আলোই প্রশস্ত যেহেতু ঐ দুই সামগ্রী শরীর ও মনের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রফুল্লতাকারক। যথাকালে শুষ্ক দুর্গন্ধহীন ফাঁকা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ বিধেয় এবং স্নান পানের জলে মলমূত্র ত্যাগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিরূপিত সময়ে নির্ম্মল জলে স্নান করিতে হইবে, শরীরে যেন কোন প্রকার মলা বা দুর্গন্ধ জন্মাইতে না পায়। মল মূত্রত্যাগ হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন স্নান ও বস্ত্র আসন শয্যা দ্বারা বাহ্য শৌচ বা কায়িক পবিত্রতা রক্ষিত হইয়া থাকে এবং স্বাস্থ্য সন্তোষ ও সত্য চিন্তাদ্বারা অন্তর শৌচ অর্থাৎ মনের পবিত্রতা রক্ষিত হয় ও সর্ব্বজন প্রিয় মধুর সত্য বাক্যদ্বারা বাক্যের শৌচ বা মুখের পবিত্রতা সাধিত হয়, পূর্ব্বোক্ত রূপে কায়মনবাক্যে যিনি নিয়ত শুচি থাকেন, পাপ বা অধর্ম্ম কদাপি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দময়ন্তী ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া মানব নলকে পতিত্বে বরণ করায় দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া নলকে অদ্ভুতকর্ম্ম সাধন বর প্রদান করিলেন, কিন্তু কলি ও দ্বাপরের অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। স্বয়ম্বর দিবসাবধি কলি নলদময়ন্তীর বিবিধ অনিষ্ট চিন্তা ও তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবার অহরহঃ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সত্যপরায়ণ

সদাশুচি নলদেহ কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিল না, দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গেল, হঠাৎ একদিন মূত্রত্যাগান্তে ভ্রমবশতঃ পাদ প্রক্ষালন না করিয়া নলরাজা সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন, নলের দেহে অপবিত্রতা জন্মিল, নল অশুচি হইলেন, ইত্যবসরে কলি নলদেহ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল এবং নলদেহে প্রবেশ করিয়া দ্বাপরের সাহায্যে নলভ্রাতা পুষ্কর কর্ত্তৃক পাশক্রীড়ায় নলের পরাজয় ঘটাইল। সত্যরক্ষা হেতু নলের রাজ্যনাশ ঘটিল, সতী দময়ন্তী সহ নল বনচারী হইলেন, কলি কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত হইলেন এবং পাপ কলিস্পর্শে দুর্ব্বল ও মলিন হৃদয় হইয়া শেষে সতী সহধর্ম্মিণী দময়ন্তীকেও বনমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় একাকিনী রাখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু দময়ন্তী সতী, কায়মনবাক্যে কদাপি স্বধর্ম্মত্যাগ করেন নাই, স্বামীসেবা করিতে কখন বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, এক্ষণে জাগরিত হইয়া হঠাৎ স্বামীর অদর্শনে, ইষ্টদেবতার অভাবে দশদিক অন্ধকার দেখিলেন, দেহ জীবনশূন্য বোধ করিতে লাগিলেন, উন্মত্তা হইয়া 'হা স্বামিন্' বলিয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন, কিছুতেই স্বামীর দর্শন পাইলেন না, তখন স্বধর্ম্ম প্রভাবে সতীত্বের বলে কলির চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন, হৃদয় সতেজ ও সবল হইল, দময়ন্তী কলিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। কলি নলদেহে কর্কোটক নাগের দংশনজনিত বিষজ্বালায় দিবারাত্রি জর্জরিত হইতে লাগিল, কলি যারপরনাই নিগৃহীত, ভীত ও নলের শরণাপন্ন হইয়া নলকে পরিত্যাগ করিল, আবার নলদময়ন্তীর মিলন হইল, আবার নলরাজ্যের পুনরুদ্ধার হইল। নল দময়ন্তীর চরিত্রে এক দিকে যেরূপ দময়ন্তীর সতীত্ব প্রভাব, অন্যদিকে তেমনই নলের অশৌচের পরিণাম দেখান হইয়াছে; সুতরাং সত্য যেমন মনুষ্য হৃদয়ের একমাত্র বল ও জীবনের ইহ পরকালের সহায়, শৌচও তদ্রূপ মনুষ্যদেহে মানুষহৃদয়ে প্রধান আয়োজন, অশুচি দেহে অপবিত্র হৃদয়ে সত্যের বসতি হয় না। মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের সাধন যেমন সত্য ও পবিত্রতা তদ্রূপ সমাজগত চরিত্রের সাধন দয়া ও দান। মনুষ্য জগতে ও ইতর প্রাণীতে দয়ার প্রকাশ ও বিস্তার দেখাইতে হয়। দয়ার কার্য্য, দয়ার অভ্যাস বুঝিতে হইলে ভগবানের দয়া স্মরণ করিতে হয়; ভগবান যদ্রূপ যাবতীয় মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা, মনুষ্যের প্রতি সেইরূপ রক্ষার ও পালনের সাহায্যভার বুঝিতে হইবে, ভাল মন্দ সকল মনুষ্যের প্রতিই দয়া ও সমবেদনা প্রকাশ ও ভালবাসা বিস্তার করিতে হয়। দয়া বিস্তারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শরণাগত রক্ষায় ইতিহাস পুরাণে অনেক স্থানে চিত্রিত হইয়াছে। দণ্ডীরাজা ত্রিভুবনে কোথাও

আশ্রয় পাইলেন না, দেবতা ও মনুষ্য সকলেরই ত্যজ্য হইলেন, নদীতীরে কান্দিতে কান্দিতে অর্জ্জুনপত্নী শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার দর্শন পাইলেন। সুভদ্রার দয়া হইল, দণ্ডীকে রোদনের হেতু জিজ্ঞাসিলেন, দণ্ডী রাজার পরিচয় পাইলেন এবং ত্রিভুবনে তাঁহার আশ্রয় নাই বুঝিতে পারিলেন, তথাপি দয়া বিসর্জ্জন করিয়া শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, দণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া নিজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন, দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই শুনিলেন দণ্ডী, দেবতা মনুষ্য সকলের ত্যজ্য হইয়া সুভদ্রার আশ্রয়ে অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন, সকলেই সুভদ্রাকে দণ্ডীত্যাগ করিতে বুঝাইলেন, বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, দণ্ডীকে ত্যাগ না করিলে পাণ্ডব দিগকে শ্রীকৃষ্ণের বিরহিত হইতে হইবে, দেবগণ ও যাদবগণের সহিত শত্রুতা করিতে হইবে, মহা অনর্থ ও অমঙ্গল সাধিত হইবে। সুভদ্রা, তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করেন পাণ্ডবকুলে এমন কাহাকেও দেখিলেন না, একমাত্র মহাবীর ভীম সুভদ্রার কার্য্যের অনুমোদন করিলেন, দণ্ডীকে ত্যাগ করিতে সুভদ্রাকে নিষেধ করিলেন, সুভদ্রার হৃদয়ের বল বর্দ্ধিত হইল। দণ্ডীত্যাগ জন্য পাণ্ডব সমীপে শ্রীকৃষ্ণ দূত প্রেরণ করিলেন, দূত সমীপে ভীম শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। সমগ্র দেবগণ ও যাদবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূলে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘোষণা হইল, উভয় দল সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব দিগের স্বধর্ম্মপ্রভাবে যেন দেবগণ ও সমরে পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন দেবপক্ষে রণক্ষেত্রে জগদম্বিকা শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব হইল, অমনি সমরানল স্বতঃই নির্ব্বাণ হইল। দেব রহস্য প্রকাশিত হইল, দণ্ডী আশ্রয়ে ঘোটকরূপী উর্ব্বসীর শাপোদ্ধার হইল, উর্ব্বসী পুনরায় স্বর্গ পাইলেন, সুভদ্রার অপার করুণা ভীমের বীরহৃদয় জগতের আদর্শ হইল। মনুষ্য জগতে দয়া প্রকাশের ন্যায় ইতর প্রাণীতেও সমবেদনা এবং অহিংসা দ্বারা দয়া বিস্তার করিতে হয় তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপে আর্য্যভূমে মুনিদিগের আশ্রমে ইতরপ্রাণীও প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, কেহ তাহাদের হিংসা করিতে সমর্থ হইত না। ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া বিস্তার ও "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই সত্যধর্ম্মের সত্যমূর্ত্তি ভগবান বুদ্ধদেব। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে দয়া প্রকাশ যেমন মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম, তেমনই মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে দান বা স্বার্থ বিসর্জ্জন দয়ার স্বাভাবিক কার্য্য এবং সেই দানের অভ্যাসও মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। শাস্ত্রে দান ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামস। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অনুপকারী

ব্যক্তিকেও দাতব্যবোধে যে দান তাহা সাত্ত্বিক, প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা ফল কামনা করিয়া সুতরাং ক্লিষ্ট অন্তঃকরণে যে দান তাহা রাজসিক ও অদেশে অকালে অপাত্রে অসম্মান ও অবজ্ঞা করিয়া যে দান তাহা তামস দান। দানের পাত্রেরও উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ তারতম্য আছে, যাহার দান গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই তিনি উত্তম, দান গ্রহণ না করিয়াও যিনি কষ্টেস্বষ্টে থাকিতে পারেন তিনি মধ্যম, এবং যাহার দানগ্রহণ না করিলেও ক্ষতি নাই সে অধম পাত্র। দান মনুষ্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, নিত্য অনুষ্ঠানধর্ম্ম, দানধর্ম্মের অদ্ভুত মাহাত্ম্য অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত মহাভারতের কর্ণচরিত্র। কর্ণজীবনে অনেক কলঙ্ক, কর্ণ গুরুসমীপে প্রতারক মিথ্যাবাদী, কর্ণ দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় ও কুকর্ম্মের নিত্য সহায়, কর্ণ সহোদরের চিরশত্রু, কুরুপাণ্ডব জীবনে কর্ণ চরিত্রের গুণ দোষ বিচারে যেন দোষেরই প্রাধান্য পরিচয়, কিন্তু কর্ণ দানধর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠানকারী, কর্ণ দানধর্ম্মের বিনিময়ে পৃথিবী স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলই ত্যাগ করিতে পারেন। দানধর্ম্ম রক্ষায় কর্ণের আতিথ্যসৎকার নিত্য নিয়ত কর্ত্তব্য, কর্ণ গৃহে অতিথি বিমুখ হইলে, আতিথ্যসৎকারের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলে, অতিথির প্রীতি সম্পাদনে অসমর্থ হইলে কর্ণ জীবনধারণ করিবেন না, ভগবান ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ রূপে কর্ণ গৃহে অতিথি হইলেন, নরমাংসভিন্ন আহারের তৃপ্তি হইবে না কর্ণকে জ্ঞাত করিলেন, অধিকন্তু জানাইলেন কর্ণ পুত্র বৃষকেতুর মাংসভিন্ন অপর নরমাংসে তাঁহার তৃপ্তি হইবে না। কর্ণ ধর্ম্মরক্ষাহেতু পুত্রের মাংস দানেও সম্মত হইলেন, সহধর্ম্মিণী পদ্মাও পতির ধর্ম্মরক্ষাহেতু পুত্রত্যাগেও কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন অতিথি ব্রাহ্মণ আবার আদেশ করিলেন "তোমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে স্বহস্তে করাত দ্বারা পুত্রের শিরশ্ছেদন করিবে এবং শিরশ্ছেদন কালীন শোকের চিহ্ন অশ্রুজল যেন বিন্দুমাত্র কাহারও চক্ষু হইতে পতিত না হয়।" কর্ণ পদ্মা অতিথির আদেশ শুনিয়া বড়ই বিপন্ন সংশয়াপন্ন, রহস্য বুঝিতে অক্ষম সুতরাং যারপরনাই কাতর হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার হানি হইবে ভাবিয়া কাতরতা ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের বল করিলেন, স্ত্রী পুরুষে অতিথির আদেশ মত পুত্রের শিরশ্ছেদন করিতেও সম্মত হইলেন, এদিকে পুত্র ও পিতার ধর্ম্মরক্ষা হইবে ভাবিয়া নিজপ্রাণদানে আহ্লাদে সম্মত হইলেন, প্রাণদিয়া পিতার ধর্ম্মরক্ষা করিবে বুঝিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন, কর্ণ পদ্মা অতিথি ব্রাহ্মণের আদেশমত অকাতরে অশ্রুত্যাগ না করিয়া পুত্রের শিরশ্ছেদন করিলেন, তখন আবার অতিথি পদ্মাকে স্বহস্তে পুত্রের মাংস রন্ধনের আদেশ করিলেন; উত্তরোত্তর

বিষম পরীক্ষা, পদ্মা তাহাতেও সম্মত হইলেন, পুত্রের মাংস রন্ধন করিলেন কিন্তু স্নেহবশতঃ পুত্রের মস্তক রন্ধনগৃহে লুক্কায়িত রাখিলেন এবং মস্তক বাদদিয়া সমুদায় শরীরের মাংসেই অতিথির উদর পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট তৃপ্তি হইবে মনে করিলেন। অতিথির আহারের জন্য মাংস প্রস্তুত হইল, অতিথি মাংস দেখিয়া কহিলেন—মাংসের অম্লভিন্ন তাঁহার তৃপ্তি হইবে না, মাংসের অম্ল রাঁধিতে পুনঃ মহিষীকে আদেশ করিলেন, মহিষী তখন অম্লের জন্য মাংস কোথায় পাইব বলিলে ব্রাহ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণ কহিলেন 'তুমি অতিথি ব্রাহ্মণকে ভয় করনা, স্নেহবশতঃ পুত্রের মস্তক লুক্কায়িত রাখিয়া আমার সমীপে মিথ্যা কথা বলিতেছ।' মহিষী তখন ব্রাহ্মণের চরণতলে পতিত হইয়া অপরাধের ক্ষমা চাহিলেন, ব্রাহ্মণের আদেশে আবার মস্তকের অম্লরন্ধন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন চারি স্থানে মাংস পরিবেশন করিতে অনুমতি করিলেন এবং রাজা কর্ণ ও মহিষী পদ্মাকে জানাইলেন যে তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জন এবং অতিথির অদূরে অবস্থিত এক শিষ্য ও তিনি স্বয়ং এই চারিজনে একত্রে মাংস ভোজন করিবেন। রাজা রাণীর আরও অধিকতর কঠিন পরীক্ষা, স্বহস্তে পুত্র বধ করিয়া, স্বহস্তে পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া আবার সেই মাংস নিজে ভক্ষণ করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা পিতা মাতার পক্ষে অসাধ্যকর্ম্ম, ঘোর যন্ত্রণা কি হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষাহেতু রাজা রাণী তাহাতেও সম্মত হইলেন। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ "বৃষকেতু বৃষকেতু" বলিয়া তাঁহার শিষ্যকে আহ্বান করিলেন, অমনি কর্ণ পদ্মার হৃৎপুত্র হারান মানিক জীবনসর্ব্বস্ব সেই বৃষকেতু আসিয়া ব্রাহ্মণ চরণে প্রণত হইলেন, পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন, দেব রহস্য প্রকাশিত হইল—ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইয়া আকাশমার্গে চিৎঘন আনন্দময় শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী মূর্ত্তিতে কর্ণ পদ্মা ও বৃষকেতুর নয়ন গোচর হইয়া কহিলেন 'কর্ণ, আমি তোমার দানধর্ম্মের পরীক্ষার জন্য অতিথি হইয়া তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, যতদিন পৃথিবীতে মানব সঞ্চার থাকিবে ততদিন তোমার এই দানধর্ম্ম জগতে কীর্ত্তিত হইবে এবং জগতে দাতাকর্ণ বলিয়া তোমার নাম জাগ্রত থাকিবে এবং এই দানধর্ম্মের প্রভাবে তোমরা স্ত্রী পুত্র সকলে দেহান্তে আমার পরমধামে আসিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে'। কর্ণ যেন শত দোষে দোষী হইয়াও এক দানধর্ম্ম প্রভাবে ভগবানের কৃপাপাত্র, আদর্শচরিত্রে যেন যুধিষ্ঠির অপেক্ষাও উন্নতচরিত, যুধিষ্ঠির স্বার্থের প্রলোভনে সত্যরক্ষায় অসমর্থ, কর্ণ অতিথি সৎকারজন্য পুত্রদানেও পরাঙ্মুখ নন। শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য

কেবল ইতিবৃত্ত স্মরণ বা শ্লোক আবৃত্তি করা নয়, মর্ম্ম বা রহস্য বুঝিতে হইবে, পলালত্যাগ করিয়া ধান্য সঞ্চয়ের ন্যায় পুরাণ ইতিহাসের ভাষা বর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া চরিত্র বাছিয়া লইতে হইবে, শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, জ্ঞানলাভ। রামায়ণে সত্য শৌচ দয়া দানের আদর্শীয় চরিত্র একত্রে চিত্রিত হইয়াছে—ভগবান্ রামচন্দ্র সত্যের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, ঠাকুর লক্ষ্মণ পবিত্রতার নির্ম্মলমূর্ত্তি এবং মা সুমিত্রা দয়া ও দানের একাধারে মিলনমূর্ত্তি। এই সত্য শৌচ দয়া দানের অভ্যাসের নামই তপস্যা, তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন কালীন আর মনুষ্যের স্বতন্ত্র তপস্যা কিছুই নাই। কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্য এক্ষণে, 'ধর্ম্ম কি?' এই কথা শুনিলে যেন বড়ই বিব্রত হইতেছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন ধর্ম্মের কোন কূল কিনারা পাইতেছে না। মানুষ আজ মোটামুটি ভাবে ধর্ম্মকে ঈশ্বর বা অভীষ্ট দেবদেবী বুঝিতেছেন এবং ধর্ম্মাচরণ বলিতে উপাসনা বুঝিতেছেন। আজ ভারতের আর্য্যসন্তান 'ধর্ম্ম' বলিতে কোন্ মন্ত্রে কিরূপ উপাসনায় কোন্ দেবতার আরাধনা প্রশস্ত, কোন্ সম্প্রদায়ের মত প্রশস্ত, কোন্ দেবদেবীর মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান শ্রেষ্ঠ না ভক্তি শ্রেষ্ঠ, যোগাভ্যাস শ্রেষ্ঠ না নামসংকীর্ত্তন প্রশস্ত, শাক্ত শ্রেষ্ঠ না বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ইত্যাদির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বুঝিতেছেন এবং এইরূপ আলোচনা বিচার মিমাংসা লইয়া সকলেই যেন দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত। এইরূপ বিকৃতবুদ্ধির না আছে শাস্ত্র, না আছে যুক্তি এবং অনেকে আবার যুক্তি শাস্ত্র বুঝিতেও ইচ্ছুক নন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর" এই এক বচন সংগ্রহ করিয়া ও তাহার সাধারণ অর্থ—তর্ক বিচার নিষেধ বুঝিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতি কোন দিকেই দৃষ্টি নাই, নিজে যাহা মনোমত সুবিধামত বুঝিবেন তাহাই ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত সুতরাং বিশ্বাসের দোহাই দিয়া তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন। 'বিশ্বাস' বলিতে এককে আর বলিয়া বুঝা নয়, কোন বিষয়ের বিচার করিয়া, মীমাংসা করিয়া চিত্তের যে সংশয়শূন্য স্থিরভাব জন্মে তাহাই বিশ্বাস, বিশ্বাস তর্কের পরাবস্থা, তজ্জন্যই বিশ্বাসের বস্তু হইতে তর্কের বস্তু বহু দূরে অবস্থিত। আর্য্যশাস্ত্রে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলিতে মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি বিংশতি ঋষি প্রণীত বিংশতি সংহিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চতুর্ব্বর্ণ মানবের যাবতীয় কর্ত্তব্যের বিচার ও কর্ম্মের মীমাংসা এবং বিধান উক্ত ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর্য্যজাতির সমস্ত নিত্যকর্ম্ম ও যাবতীয় সংস্কার উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুসারে নিষ্পন্ন, আচরিত হইয়া থাকে। ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রের

অনুমোদিত চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, দর্শন বিচার ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ দর্শনের সাহায্যে পদার্থ প্রাণী ও ব্রহ্মের বিচার মীমাংসা হইয়া থাকে এবং যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণের মূল শাস্ত্র বেদ। বেদ আদি শাস্ত্র, অপৌরুষেয়, বেদের সর্ব্বত্র প্রাধান্য, সমস্তই বেদের অন্তর্ভুক্ত, বেদ বিরুদ্ধবাক্য অগ্রাহ্য কুবাক্য, বেদের বিরুদ্ধ বিধান অবিধান, বেদ নিন্দুক নাস্তিক, আবার তন্ত্র-শাস্ত্রও তদ্রূপ মানব প্রণীত বা ঋষিগ্রন্থ নয়, শিব শিবার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য সুতরাং যাবতীয় শাস্ত্রই তন্ত্রের অন্তর্গত, তন্ত্রশাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে উপাসনা শাস্ত্র, কিরূপ ভাবে দেবদেবীর উপাসনা করিতে হয়, মানুষে কি উপায়ে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, সহজে মুক্ত হইতে পারে, তন্ত্র যেন তাহারই সহজপন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন সেই জন্যই এমন কি কোন কর্ম্মের সহজ সংক্ষেপ ব্যবস্থাকে তান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া থাকে। এক্ষণে বেদ তন্ত্র সংহিতা দর্শন পুরাণ প্রভৃতি হইতে চতুর্ব্বর্ণ মানবের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ ধর্ম্মের সাধারণ অর্থ স্মরণ রাখিতে হইবে, 'ধর্ম্ম' অর্থে স্বভাব বা স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং 'কর্ত্তব্য' অর্থে সেই স্বভাবের অনুগমন বা স্বাভাবিক কর্ম্মের আচরণ, মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম নিরূপণ ও সেই কর্ম্ম করণের বিধান যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্ম বেদে আছে না তন্ত্রে আছে, সংহিতায় আছে না ইতিহাসে আছে, পুরাণে আছে না দর্শনে আছে, বেদ বড় না তন্ত্র বড় ইত্যাদির বিচার না করিয়া ধর্ম্ম যেখানে থাকুক না কেন ধর্ম্মকে চিনিয়া লইতে হইবে। মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রতিপালন মনুষ্যের স্বধর্ম্ম হইলেও ঈশ্বরোপাসনা ও সেই স্বধর্ম্মের অঙ্গ কি না ও কোন্ সময় কিরূপ ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয় ইহার বিচার ও মীমাংসা করিতে হইবে; কেন না ধর্ম্ম লইয়া আজকাল যতকিছু গোলযোগ হইতেছে তাহার কারণ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর এবং ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনার তারতম্য বুঝিতে না পারা। স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রতিপালন যেমন মনুষ্যের স্বধর্ম্ম, ঈশ্বরোপাসনাও তদ্রূপ, স্বাভাবিক কর্ম্ম পালনে যদ্রূপ সাধারণ নিয়মাধীন থাকিতে হয়, ঈশ্বরোপাসনাও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, ঈশ্বরোপাসনার জন্য আত্মজ্ঞানের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ "আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতা ক্রিয়াঃ, কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ, সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে।" প্রথমে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সত্য শৌচ দয়া দান সাধারণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পর আত্মজ্ঞানের জন্য, ভগবল্লাভের জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় লইতে হয় সুতরাং সেই সময় ঈশ্বরোপাসনার আরম্ভ কাল

যেরূপ বাল্য অতিক্রান্ত না হইলে যৌবনের উদ্ভব হয় না, যৌবনান্ত না হইলে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় না তদ্রূপ স্বাভাবিকধর্ম্ম সংসারধর্ম্ম সুসম্পন্ন না হইলে ভগবদ্ধর্ম্ম বা মোক্ষধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় না, তজ্জন্যই শাস্ত্রে অধিকার ভেদের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টিরাখিতে উপদেশ আছে ও অনধিকার চর্চ্চা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসংখ্য শাস্ত্র গ্রন্থের সংসারধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের নানাবিধ জটিল উপদেশ হইতে, নানাবিধ জটিল চিত্র ও চরিত্র হইতে ধর্ম্ম বাছিয়া লওয়া ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসার ধর্ম্মের সঙ্গে মোক্ষধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া, ও মোক্ষধর্ম্মে সংসারধর্ম্ম মিশাইয়া কোন ধর্ম্মেরই মীমাংসা ও অনুষ্ঠান হইতেছে না। আবার এই সংসারধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের মাঝখানে এক বিপরীত বিরাট প্রবৃত্তিধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়াছে, প্রবৃত্তি ধর্ম্মের সাধন-প্রবৃত্তির বা কামনার অনুরূপ ফল বা সিদ্ধিলাভ জন্য সিদ্ধিদাতা দেবদেবীর উপাসনা; কাজেই ধর্ম্ম উত্তরোত্তর দুর্ব্বোধ হইয়াছে। সংসারধর্ম্ম, প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ রূপের মধ্যে সংসারধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম স্বাভাবিক, সংসারধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বভাবসিদ্ধ, কর্ত্তব্যবোধে এবং প্রবৃত্তি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি বা কামনা চরিতার্থতা সুতরাং কর্তৃত্ব অহঙ্কার ও অভিমানউৎপাদক। তজ্জন্যই শাস্ত্র সকামকর্ম্ম সকাম উপাসনা হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রে এই ত্রিবিধধর্ম্মেরই উপদেশ ও তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে এবং পৃথক পৃথক চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। শাস্ত্রপাঠ করিয়া ধর্ম্মনির্ণয় করিতে হইবে ও শাস্ত্রোপদেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে এবং শাস্ত্রীয় চরিত্রের আদর্শে চরিত্রগঠন করিতে হইলে ধর্ম্মের ঐ ত্রিবিধরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, যেন এক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান মিশ্রিত না হয়, মিশ্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ধর্ম্মেরই ফলপ্রাপ্তি হয় না। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" তারকব্রহ্ম হরিনাম মুক্তির উপায়, তাই বলিয়া নিত্য কর্ত্তব্য সন্ধ্যার উপাসনা কালীন সন্ধ্যা-বন্দনা ত্যাগ করিয়া হরিনাম করিলে চলিবে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, তাই বলিয়া যৌবনারম্ভে দারপরিগ্রহ না করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিবার বিধান হইতে পারে না। পৌরাণিক চরিত্রে ও ভগবানের অবতার কার্য্যে সংসারধর্ম্ম ও মোক্ষ-ধর্ম্মের পৃথক পৃথক ক্রম কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সংসারধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের মিশ্রণ হইতে পুনঃ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা দেখান হইয়াছে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বাল্যকালে

নিষ্কাম মোক্ষধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতা হিরণ্যকশিপু ও জগতকে "ভগবান সত্য ও সর্ব্বব্যাপী" ইহা দেখাইয়াছিলেন, ভগবানের দর্শন ও প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ জগতে উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে "বাল্য হইতেই মোক্ষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য," কিন্তু ভগবান বাল্যে প্রহ্লাদের মুক্তিবিধান করিলেন না। ভগবদাদেশে প্রহ্লাদ আবার সংসারধর্ম্ম করিলেন এবং শেষজীবনে পুনরায় মোক্ষধর্ম্মের অনুগামী হইয়া দেহান্তে ভগবৎসঙ্গলাভ করিলেন, তদ্রূপ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের সাধক ধ্রুবের বাল্যকালে ভগবৎ দর্শন ও অভীষ্টসিদ্ধি হইলেও ভগবান বাল্যেধ্রুবের ধ্রুবলোকপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন না, ধ্রুব আবার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া দেহান্তে ধ্রুবলোকে গমন করিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়েরধর্ম্ম যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা ও মোহ দেখিয়া তাঁহাকে নিবৃত্তিমার্গের চরম মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া, নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াও কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বর্ণোচিত সংসারধর্ম্ম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি করাইলেন এবং অর্জ্জুনের সংসারধর্ম্মের পালনান্তে উত্তরকালে আবার তাঁহাকে নিবৃত্তিধর্ম্ম উত্তরগীতা শুনাইলেন। যথাকালে নিবৃত্তিধর্ম্মের উপদেশে বৈরাগ্যোদয় হইল, অর্জ্জুন মহাপ্রস্থান করিলেন। স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা সংসারধর্ম্মকালীন যেমন নিত্য সত্যশৌচ দয়া ও দান ধর্ম্মের চারি মূর্ত্তির স্মরণ ও অনুষ্ঠান করিতে হয় তদ্রূপ সংসারাশ্রমে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম, ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে কর্ত্তব্য বোধে করিতে হইবে, যেন কদাচ কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ইন্দ্রিয় প্রীতিবোধ না জন্মে, এইরূপ ভাবে কর্ম্মকরণ জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে কার্য্যারম্ভের অগ্রে "শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ" সঙ্কল্পমন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণং ॥" সুতরাং "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং ॥" এই জন্যই সংসার ধর্ম্মই মোক্ষধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ। সংসার ধর্ম্ম কালীন স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে কি না ইহার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, বুঝিতে হইবে সংসারাশ্রমের কার্য্য বা কি, আর ঈশ্বরোপাসনাই বা কি। সংসারাশ্রমের কার্য্য ঈশ্বরেরই কার্য্য, উপাসনা অর্থে ঈশ্বরকে ডাকা ও স্মরণকরা, যাঁহার কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ বা ডাকিয়া কার্য্যারম্ভ ভিন্ন কার্য্যকালীন স্মরণ বা ডাকিবার নিয়ম হইতে পারে না এবং কার্য্যকালীন কার্য্যে মনঃসংযোগ না করিয়া যাহার কার্য্য তাঁহাতে মনঃসংযোগ করিলে কার্য্য

সুসম্পন্ন হয় না। পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার আদেশ প্রতিপালনকরা, পিতার আদেশমত কার্য্যকরা, পিতার আজ্ঞামত পুত্রের কার্য্য দেখিলেই পিতার প্রীতি-জন্মে, পিতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন, স্নেহে আলিঙ্গন করেন; কিন্তু কার্য্য না করিয়া 'পিতঃ পিতঃ' বলিয়া পুত্রের চিৎকার বা হা পিতা বলিয়া পুত্রের ক্রন্দন শুনিলে পিতার তৃপ্তি হয় না পরন্তু অসন্তোষ জন্মে। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন-কালীন কার্য্যারম্ভে ও কার্য্যান্তে ভগবান্‌কে স্মরণ বা আহ্বান করিতে হয়, প্রাতে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া, ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান, স্নানের পূর্ব্বে ভগবন্নাম উচ্চারণ, আহারের পূর্ব্বে ভগবান্‌কে স্মরণ, ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার, যাত্রাকালীন ভগবন্নাম উচ্চারণ, ভগবানের নাম করিয়া শয়ন সুতরাং সংসারাশ্রমের যাবতীয় কার্য্যে ভগবানের উপাসনা, তাঁহার স্মরণ বা নামকীর্ত্তনভাবে জড়িত থাকে, স্বতন্ত্র উপাসনাকার্য্যের আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মণাদির যে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা ও নিত্যযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তাহাও এই ভগবানের স্মরণবোধক কর্ত্তব্য নিত্য উপাসনা ও স্বাস্থ্য এবং চিত্তশুদ্ধির উপায় বা সহায়। সংসারধর্ম্মপালনান্তে মোক্ষধর্ম্মের অধিকার, তখন আর অপর কোন কর্ত্তব্য নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া অবসর পাইয়া প্রিয়জন সঙ্গলাভে যাদৃশী স্বাভাবিকপ্রীতি ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং প্রিয়সঙ্গ হারাইতে যেরূপ স্বাভাবিক অনিচ্ছা ও কষ্ট হয় তদ্রূপ অহরহঃ ভগবানের নাম, ভগবানের কথা ভগবানের চিন্তা, ভগবানের ধ্যান, ভগবানের রূপদর্শন ও ভগবানের পরিচর্য্যা ও ভগবৎসঙ্গ করিতে হয় এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ভগবানে তন্ময়ত্ব আসে, আমিত্ববোধ বা নিজের পৃথকসত্ত্বা তিরোহিত হইয়া মন প্রাণ ভগবানে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং আর জীবরূপে পুনরাবৃত্তি হয় না ইহারই নাম মুক্তি বা কৈবল্যপ্রাপ্তি। সংসারধর্ম্মপালনেও দেবতা দর্শন, দেবসমাগম এবং ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎসঙ্গ পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র সাধন উপা-সনার আবশ্যক নাই; তাহার দৃষ্টান্ত বা প্রমান স্বরূপ ইতিহাস পুরাণে ঋষিদিগের আশ্রমে, রাজাদিগের আলয়ে, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগের গৃহে মধ্যে মধ্যে দেব সমাগম ও দেবতালাপ চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে এমন কি মনুষ্যের দেবলোকে গমন ও দেবতা মনুষ্যের মিলনচিত্র ও অঙ্কিত হইয়াছে। সংসারধর্ম্মকালীন্ দেবতা-সঙ্গ ভগবদ্দর্শন স্থায়ী হয় না, যতদিন মানবকে কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হয়, যতদিন মানবের আমিত্ববোধ ও ভগবানমানবের পার্থক্যজ্ঞান থাকে ততদিন মানবের ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎসঙ্গ ঘটিলেও তাহা নিত্য স্থায়ী হইতে পারে না,

এই জন্যই নিবৃত্তিমার্গে ভগবানের নিষ্কাম উপাসনায় কর্ম্মক্ষয় ও কর্ম্মের অবসান করিতে হয়; আমিত্বের ধ্বংস হইলে শিব ও জীব এক হইয়া "জীব শিব শিব জীব" অভিন্নভাবে এক অদ্বিতীয় রূপে প্রতিপন্ন হয়। সংসারধর্ম্ম ও মোক্ষ-ধর্ম্মের এই অধিকারভেদে ব্যবস্থা বুঝিলে আর মৃত্যু পুনর্জ্জন্ম পাপ পুণ্য স্বর্গ নরকের চিত্রে বিচলিত হইতে হয় না। মানব স্বধর্ম্মচ্যুত স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াই যাতনা বা পাপভোগ করে সুতরাং নরকের বা অধঃপতনের ভয়ে ভীত হয়। প্রথমে স্বকর্ম্মদোষে পাপ সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহার উদ্ধার জন্য পুণ্যের আকাঙ্খা ও তদনুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু হইলে, জন্ম মৃত্যু জন্য কোন চিন্তা বা ভয়ই হইতে পারে না, কেননা মনুষ্যের জন্ম বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু স্বাভাবিক, যাহা স্বাভাবিক তাহা সহজে নিষ্পন্ন হয় এবং তজ্জন্য কোন যন্ত্রণা বা ভয়ের কথা দূরে থাকুক কখন কি হইতেছে অনুভবই হয় না, যেন অবাধে অলক্ষ্যে ঘটিতে থাকে। মনুষ্য শরীরে যেমন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য অবস্থার পরিবর্ত্তন মনুষ্য কিছুই বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারে না তদ্রুপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা, মনুষ্য, কি ভাবে জন্মিয়াছে, কি ভাবে গর্ভে অবস্থিতছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া আজীবন তাহার কোন স্মৃতি বা অনুভূতি আনিতে পারে না ও তজ্জন্য কোন প্রকারে সুখ দুঃখ ও অনুভব করে না, তবে জন্ম লইয়া যতকিছু আন্দোলন ছুট্ফটানির কারণ—শাস্ত্রে গর্ভাবস্থা বিষয়ে নানাবিধ বর্ণনা ও গর্ভযন্ত্রণার নানাবিধ বিভীষিকার চিত্র; মৃত্যুর অবস্থাও জন্মের ন্যায়। "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরা স্তত্র ন মুহ্যতি॥" স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বিকৃতস্বভাব মানবের পক্ষেই জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা ও বিভীষিকার ভয় কিন্তু ধার্ম্মিকধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না।

আয়ুর্ব্বিভাগ—আশ্রম নির্দ্দেশ।

বাল্যকাল।

মানবের সাধারণ পরমায়ুকাল একশত বৎসর, তন্মধ্যে জন্মকাল হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল, পাঁচ হইতে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস ও কর্ম্মশিক্ষার কাল এবং পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মজীবন বা সংসার-কাল, পঞ্চাশ হইতে পচাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য বা নিবৃত্তিকাল এবং পচাত্তর হইতে তদূর্দ্ধকাল জীর্ণদশা বা মৃত্যুকাল। এই বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল্ পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিত, কিরূপ ভাবে মনুষ্য জীবন গঠিত ও চালিত হইলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবন সুখময় থাকিতে পারে ও জীবনান্তে পুনরাবৃত্তি ঘুচিয়া যায় তাহারই জ্ঞান ও ব্যবস্থাজন্য পরমায়ুকাল বিভাগ করিবার আবশ্যক হয়। মনুষ্য দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু স্বাভাবিক অবস্থা, এই স্বাভাবিক কাল্ কি উপায়ে তুল্যরূপে সুখে কাটিয়া যায় তাহার আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে মানুষ স্বভাবের সেবক হইতে পারিলে এবং কখনও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম না করিলে তাহার স্বাভাবিক কাল্ কখনও কষ্টকর হইতে পারে না। এক্ষণে মনুষ্যের স্বভাব বলিতে বর্ত্তমান মনুষ্য যে ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে ও উত্তরোত্তর সেই ভাবের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ স্বভাব নয় এবং ঐ রূপ স্বভাবের অনুরূপ বা প্রীতিকর কার্য্যানুষ্ঠানের নামও স্বাভাবিক কার্য্য নয়। বর্ত্তমান কালে সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, বিকৃত স্বভাব মনুষ্যের সন্তান সন্ততির ও সাধারণতঃ স্বভাবসিদ্ধ বিকৃত স্বভাব ঘটিয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ের মনুষ্যের কিরূপ ভাবে সাধারণ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্ব ২ প্রকরণে দেখান হইয়াছে, "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহর হরি।" এই প্রার্থনায় যেন বর্ত্তমান সময়ের মানবের যথার্থ আত্মপরিচয় দেয়, 'পাপাত্মা' 'পাপ সম্ভব' উক্তি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি টানিয়া আনে, বিকৃত স্বভাবের কারণ বুঝাইয়া দেয়, তজ্জন্যই স্বভাব বলিতে বর্ত্তমান মানবের সাধারণ ভাব, ও স্বাভাবিক কার্য্য বলিতে বর্ত্তমান মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্য না বুঝিয়া প্রকৃত মনুষ্যের স্বভাব ও স্বাভাবিক কার্য্য বুঝিতে হইবে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান মানবের পরিমিত পরমায়ুকাল কিরূপ

ভাবে প্রকৃত মনুষ্যের ভাবে কাটিয়া যায় তাহারই আলোচনা ও ব্যবস্থা জন্ম এই পরমায়ু বিভাগের উদ্দেশ্য।

বাল্যকালে মনুষ্যজীবন যেন সর্ব্বদাই পরাধীন অথচ চিন্তাশূন্য আনন্দময়, বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারের ভার, হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানের ভার, স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, রোগ ও মৃত্যুর ভাবনা ইত্যাদি সমস্ত ভার সমস্ত চিন্তা পিতা মাতার। বালককে নিজে কিছুই করিতে বা ভাবিতে হয় না যেহেতু বালক স্বভাবতঃ কার্য্যকরণের উপায় উদ্ভাবন বা ভাবনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; কিন্তু জন্ম হইতে উর্দ্ধসংখ্যা পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত এই বাল্যকালে বালকজীবনের কতক গুলি স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হয়—বালক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, চলিতে শিখে, খেলিতে শিখে, কথা কহিতে শিখে, যাহা দেখে যাহা শুনে তাহারই যেন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে ও সাধ্যমত অনুকরণ ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান ও করিয়া থাকে। বাল্যজীবন শিক্ষাজীবন ও কর্ম্মজীবন অথবা সমগ্র জীবনের অনুকরণ ক্ষেত্র, বাল্যকালে শিক্ষার ও কর্ম্ম জীবনের অনুকরণ বা ইচ্ছাবৃত্তি স্বভাবতঃ উদয় বা জাগরিত হয় এবং সেই ইচ্ছাবৃত্তি বা বাল্যসংস্কারগঠনের মূলকারণ-বাহিরের দৃশ্য, সংসারের চিত্র। বাল্যকালে বালকের কোন কর্ত্তব্য নাই বটে কিন্তু বালকের আহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছাড়া পিতা মাতার উপর অনেক গুরুতর ভার থাকে। বাল্য জীবনই মনুষ্য জীবনের প্রত্যুষকাল, এই কালে যে সংস্কার জন্মে তাহা বহুকাল বা আজীবন স্থায়ী হয়, সুতরাং সেই সংস্কারের পরিবর্ত্তন করাইতে বহুকাল লাগে বা কোন কালেই পরিবর্ত্তন হয় না, যেরূপ কাঁচা মাটির পাত্রে অগ্রে দাগ দিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া পশ্চাৎ সেই পাত্র অগ্নিতে পোড়াইলে আর সেই পোড়ান কঠিন পাত্রের দাগ বা চিত্র, পাত্র ভগ্ন বা চূর্ণ বিচূর্ণ না করিলে কিছুতেই নষ্ট বা মুছিয়া যায়না তদ্রূপ বালকের কোমল মস্তিষ্কের সংস্কার বয়ঃপ্রাপ্তকাল বা পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে আর সে সংস্কার আজীবন ঘুচিবার নয়। বালকের যাহাতে বাল্য সংস্কার বিশুদ্ধ মঙ্গলদায়ক ও উন্নতিকারক হয় তদনুযায়ী বাহিরের দৃশ্য বা চিত্র দেখাইতে হইবে। সত্য শৌচ দয়া দান সাধারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে বালকের সংস্কার গঠন করিতে হইবে। বালককে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় সত্য মৌখিক শিক্ষা করাইতে হইবে ও বালক যাহাতে মিষ্টভাষী হয় চেষ্টা করিয়া তদ্রূপ শিক্ষাদেওয়া আবশ্যক। দেবতা ও গুরুজনকে ভক্তি করিতে, আত্মীয়কে সম্মান ও ভালবাসিতে ও সকলকেই আদর করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ভয় স্বাভাবিক বৃত্তি, সুতরাং বালককে ভয়

না দেখাইয়া যাহাতে নির্ভীক ও সাহসী হয় তদ্রুপ উপদেশ দিতে হইবে। বালক পরিমিত খাইতে অনিচ্ছুক হইলে ভয় না দেখাইয়া কিম্বা "অন্যে খাইয়া-দিবে" ইত্যাদি ঈর্ষা হিংসা পরশ্রীকাতরতার সংস্কারজনক বাক্য না শুনাইয়া, ভুলাইয়া বা অন্যমনস্ক করিয়া আহার করান উচিত। বাল্যকালে ব্যগ্রতা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করান ব্যবস্থা নয়, প্রথমতঃ বালকের শারীরিক স্ফূর্ত্তি পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, বালককে নির্দ্দোষ ক্রীড়া শিক্ষা করাইতে হয়। প্রথমতঃ রীতিমত বিদ্যাধ্যয়ন না করাইয়া মৌখিক শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। বালক যতদূর অনুকরণ করিতে পারে ও স্মরণ রাখিতে পারে তদনুরূপ গল্প ও উপদেশ এবং চিত্র দেখাইতে হয়। ভাল মন্দের মৌখিক বিচার শিক্ষা করান কর্ত্তব্য, বালককে মধ্যে ২ বিদ্যালয়ে বা ছাত্রদের পড়িবার স্থানে লইয়া যাওয়া ও তদ্রূপ মাঝে ২ দেবালয়েও লইয়া যাইতে হয়। বালক যাহা সহজে ধারণা করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে তদ্রুপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, উচ্চ বংশীয় বালককে নীচবংশীয় বালকের সঙ্গ ও নীচ জাতীয় অন্নগ্রহন করিতে দেওয়া উচিত নয়, সকল দেশের মধ্যেই প্রায়ই দেখিতে পায় নীচ জাতীয় দাস দাসী দ্বারা বালক বালিকার অধিকাংশ সময় লালন পালন হইয়া থাকে ও অনেক সময় নীচ জাতীয় দাসীর বা স্ত্রীর স্তন দুগ্ধপানে ও নীচ জাতির ঘরে বালক বালিকার অন্নগ্রহনে কোন রূপ দোষ বা পাতিত্য জ্ঞান হয় না; ঐরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গর্হিত, সাধাপক্ষে বালক বালিকার নীচসঙ্গ ও নীচ সংস্পর্শ সুতরাং নীচ জাতির স্বভাব ও আচরণের অনুকরণ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা উচিত। বাল্য-কাল বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার সময়, বাল্যকালে ভাল করিয়া বালকের পুষ্টি ও বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহ জন্মাইতে না পারিলে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল ভাল হইতে পারে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাল নিয়মিত রূপে অতিক্রান্ত না হইলে উত্তরোত্তর কাল সুখকর ও সহজসেব্য হয় না। বাল্যকালে বালক বালিকার শিক্ষার তারতম্য রাখিতে হইবে, বালিকার ভবিষ্য জীবনের উপযোগী উপদেশ ও তদনু-যায়ী চিত্র বা দৃষ্টান্ত দেখান আবশ্যক, বালিকাদের ক্রীড়া বা ব্যায়াম বালকদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তারতম্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং বালিকার বালিকা সঙ্গই প্রশস্ত। বালক বালিকার শিক্ষা, উপদেশ ও লালন পালনের ভার বাড়ীর লোকের হাতে সম্পূর্ণভাবে থাকিলেই বিশেষ উপকারী ও মঙ্গল দায়ক হয়। বালক বালিকার চরিত্রগঠন তাহাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়াই পিতা মাতার ও অভিভাবকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার কথা।

বাল্যজীবনেই বালক বালিকার হৃদয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্ম্মের ভাবসঞ্চার ও মনুষ্যত্বের বীজবপন আরম্ভ হইয়া থাকে। দ্বিজাতিদের দশ সংস্কারের অধিকাংশই বাল্যকালে সমাধা হইয়া থাকে, গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত বাল্যকালেই নিষ্পন্ন হইবার ব্যবস্থায় সহজেই বুঝাযায় যে গর্ভাবস্থা হইতে বাল্যকাল পর্য্যন্ত বালক বালিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক ও অহরহঃ বালক বালিকার মঙ্গল কামনা করিতে হয়; এবং ঐরূপ যত্ন ও মাঙ্গলিক কার্য্যের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আত্মরক্ষায় অসমর্থ বালক বালিকার জীবনরক্ষা ও দেহের পুষ্টিসাধন নয়, অধিকন্তু বালক বালিকার উত্তরকাল যাহাতে মঙ্গলজনক ও সুখপ্রদ হয় তদনুরূপ বালক বালিকার সংস্কার গঠন সুতরাং মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই উদ্দেশ্য. বাল্যজীবন মনুষ্যত্ব বৃক্ষের ক্ষেত্র স্বরূপ, পিতা মাতার অভিভাবকের নিয়মিত বিশুদ্ধ লালন পালনে সেই ক্ষেত্র উর্ব্বর ও তাঁহাদের উপদেশ শিক্ষায় সেই উর্ব্বরক্ষেত্রে মনুষ্যত্ববীজ রোপিত হইয়া থাকে. পরে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মনোহর বৃক্ষে পরিণত হয় ও নানাপ্রকার মনোরম শাখা প্রশাখা পত্র পল্লব বিস্তার করিতে থাকে এবং কর্ম্মজীবনে সংসারাশ্রমে সেই বৃক্ষের মধুর ফল-পুষ্পে জগতের আনন্দ ও মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব বাল্যকাল উপেক্ষা করিবার কাল নয় পরন্তু সমধিক যত্ন ও লক্ষ্য রাখিবার সময়।

বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

বিদ্যাশিক্ষা বা কর্ম্মশিক্ষার নিরূপিত কাল ৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত, এই কালই মনুষ্য জীবনের তপস্যাকাল দ্বিজাতিদিগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, এই কালের সাধন সিদ্ধির উপর মনুষ্যের আজীবনকাল ও পরকাল নির্ভর করিয়া থাকে। এই কালে মনুষ্যের শরীর মন ও চরিত্রের পূর্ণগঠন হয়, সুতরাং শরীর মন ও চরিত্র কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানব জীবন সুখের, ও জগতের কল্যানসাধক হয় তাহারই উপদেশ ও কার্য্যানুষ্ঠান জন্য এই বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল নিরূপিত হইয়াছে, এই কালে মনুষ্য জীবনের ঐহিক পার-

ত্রিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে, সংসারাশ্রমে ও বৈরাগ্যদশায় এই কালের উপদেশেরই কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি ঘটিতে থাকে। সংসারাশ্রমে বা বৈরাগ্যদশায় নূতন উপদেশের বিষয় কিছুই থাকে না, কেবল মাত্র এই কালের উপদেশানুযায়ী কর্ম্মের অভ্যাস ও আচরণ করিতে হয়। তজ্জন্যই ঋষিদিগের আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বর-তত্ত্বনির্ণায়ক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র পর্য্যন্ত পঠিত হইত, যাবতীয় কালের কর্ত্তব্য বিচার ও পন্থা নির্দ্দেশ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই শিক্ষা করিতে হয়, যেন সংসারাশ্রমে বা বৈরাগ্য দশায় স্বতন্ত্র উপদেশ বা বিচার জন্য চিত্তে নূতন আকাঙ্খা বা উদ্বেগ না জন্মে; কেননা সংসারাশ্রমে ও বৈরাগ্যদশায় মানবের নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার উৎসাহ অবকাশ ও সামর্থ্য থাকে না, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মানবের সমগ্র-জীবনের কর্ত্তব্যবোধক উপদেশ ক্রম ও কাল নিরূপিত হইয়া থাকে, শরীর, মন ও চরিত্রগঠনের এই মহামূল্য বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এক্ষনে রীতিমত পালন না হওয়া হেতু সংসারাশ্রম যারপরনাই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং বৈরাগ্য দশার বা বানপ্রস্থাশ্রমের আর কথা কি! উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এক্ষণে মানবের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা একেবারেই হইতেছে না, আজ ভারতে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার গুরু বা আচার্য্য যথার্থ ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছেন, তাই ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, ভারতের মনুষ্য কষ্টজিবী দরিদ্র দুর্দ্দশাপন্ন সুতরাং ঘৃণিত, ভারতের সেই আচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ দেখিলে মনে বড়ই আক্ষেপ বা সময়ে সময়ে বিস্ময় জন্মে যেন বর্ত্তমান সাধারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামের যোগ্যই নন অথবা "ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধরেণং" এই শাস্ত্রীয় প্রমানের স্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের গুরু, সমগ্র মানবের ইহকাল ও পর-কালের উপদেষ্টা, চতুর্ব্বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ বলিতে শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতধারী ত্রিসন্ধ্যা-সেবী প্রত্যহ শিব বিষ্ণু পূজাকারী নিত্য-হোমপরায়ণ বেদাভ্যাসী অথবা অহরহঃ ঈশ্বর-পরায়ণ বা ভগবন্নামকারী ব্রাহ্মণ বুঝায় না, অধিকন্তু চতুর্ব্বর্ণের বা সমগ্র মানবের যাবতীয় বিদ্যার ও কর্ম্মের শিক্ষাদাতা নিত্য সত্যশৌচ দয়াদান পরায়ণ দেবতা মনুষ্য ও সর্ব্ববিধ প্রাণীর পুষ্টি ও প্রীতিকারক যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দেব চরিত্র তপস্বী ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, আচার্য্য তপস্বী ব্রাহ্মণের ছাত্রেরা ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের আশ্রম তাপসাশ্রম, ব্রাহ্মণ সেবিত বন তপোবন, এমন বিদ্যা নাই এমন কর্ম্মনাই যাহা ব্রাহ্মণের অবিদিত থাকিতে পারে। ব্রাহ্মণ কৃষি শিল্পের

শিক্ষাদাতা ও উন্নতির আবিষ্কর্ত্তা, ব্রাহ্মণ চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষক, ধনুর্ব্বেদের শিক্ষক, জ্যোতিষের শিক্ষক, সঙ্গীত বা গন্ধর্ব্ববিদ্যার গুরু, ব্রাহ্মণ শরীরতত্ত্বের গুরু, ব্রাহ্মণ আত্মতত্ত্বের গুরু, "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" ব্রাহ্মণ সেই পরমাত্মার পদের বা স্বরূপের প্রদর্শক। ব্রাহ্মণ দৃষ্টিতে পূর্ণজীব, পূর্ণমনুষ্য, জীবন্ত দেবতা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র মানবের রাজা হইয়াও রাজকার্য্যে রাজভোগে উদাসীন, স্পৃহাশূন্য, নিত্য তপোরত, তাই ব্রাহ্মণ দেবলোকেও আদর ও পূজার সামগ্রী এমন কি শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানও যেন শ্রেষ্ঠবোধে ব্রাহ্মণকে আদর ও পূজা করিয়াছেন। জীবের ব্রাহ্মণত্বলাভের পর আর শ্রেষ্ঠগতি কিছুই থাকিতে বা হইতে পারেনা, স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ দেহান্তে ভগবানেই মিলিত হন অথবা জীবন্মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাকৃত দেহধারণ করিয়া ভগবদনুকরণে জীবের মঙ্গলসাধন জন্য ইচ্ছামত জীবজগতে আবির্ভূত ও বিচরণ করিয়া থাকেন। যতদিন ঐরূপ গুরুসম্প্রদায় ব্রাহ্মণের পুনরায় আবির্ভাব না হইবে ততদিন প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হইবে না, কাজেই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য শরীর মন ও চরিত্র ও গঠিত হইবেনা, এক্ষণে সেই গুরু সম্প্রদায়ের অধঃপতিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মণমণ্ডলী একবার তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কার্য্য ও চরিত্র স্মরণ করুন, কেমন করিয়া আবার পূর্ব্ব বংশগৌরব টানিয়া আনিবেন পূর্ব্বভাবে জগৎপূজ্য হইবেন, কেমন করিয়া আবার চতুর্ব্বর্ণের যথার্থ গুরু হইবেন, তাহার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হউন, প্রকৃত চরিত্র দেখাইতে আরম্ভ করুন। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়া দুঃসাধ্য নয়, ব্রাহ্মণগণ মনে করিলেই আবার সেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, কেহ হয়ত বলিবেন পূর্ব্বে ভারতের রাজারা ব্রাহ্মণদের পালনভার গ্রহণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা কেমন করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ থাকেন, কেমন করিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুগিরি চালাইবেন, তদুত্তরে উপস্থিত সময়ে শাস্ত্রানুমোদিত এইমাত্র ব্যবস্থা হইতে পারে ব্রাহ্মণগণ জীবিকার জন্য বৈশ্যবৃত্তি কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও চিকিৎসা-ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই একেবারে শূদ্রবৃত্তি চাকুরী বা দাসত্ব গ্রহণ করিবেন না, শূদ্রবৃত্তি চাকুরী দ্বারা ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মপালন কোন ক্রমেই হইতে পারে না, শুদ্ধ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন স্বধর্ম্মপালনের ব্যাঘাত নয়। এইরূপ ভাবে কিছুকাল কাটাইয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসম্প্রদায় স্বধর্ম্মরত ও তপস্যাপরায়ণ হইতে পারিলেই অল্পকাল মধ্যেই আবার পূর্ব্ববৎ রাজদ্বারে সম্মানিত ও পূজিত হইবেন, আবার রাজা, যে জাতিই হউন না কেন

বাধ্য হইয়া, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মণের পালনভার গ্রহণ করিবেন, কারণ যে মানুষের উপর দেবতা ভগবান প্রসন্ন থাকেন মানুষের নিকট আদর বা সম্মান-লাভ তাঁহার নিকট অতিতুচ্ছ পদার্থ, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্রে দেখাইতে পারিলে স্বতন্ত্র করিয়া কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাইতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে চরিত্রবান্ বিদ্বান্ গুরুর সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে, এক্ষণে যাঁহারা শিক্ষক পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই পণ্ডিতের লক্ষণ নাই, "মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" যিনি পণ্ডিত বা গুরুস্থানীয় হইয়াছেন তিনি যদি পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিতে না শিখিয়াছেন, পরদ্রব্য পরধন লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান না করেন ও আত্মবোধে সর্ব্বপ্রাণীর উপর সমবেদনা ও প্রীতিবিস্তার করিতে না শিখিয়াছেন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বা পাণ্ডিত্য নিষ্ফল বা তিনি পণ্ডিত বা গুরুনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য, অনধিকারী। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য মনের উন্নতি সাধন ও চরিত্রগঠন, গ্রন্থব্যাখ্যা বা বাকপটুতা নয়। নীচমনা ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষায় বড় বড় উপাধিধারী হইলেও উন্নতমনা ও সচ্চরিত্র অবিদ্বান অপেক্ষা সহস্রাংশে নিকৃষ্ট অথবা উভয়ের তুলনাই হইতে পারে না। তাইবলি, যখন গুরু বা আচার্য্যের দশাই এইরূপ ঘটিয়াছে তখন আর ছাত্রের উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হয়! "স্বয়মসিদ্ধ কথং পরান সাধয়তি," উপস্থিত সময়ে ভারতের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার সংস্কার করিতে হইলে যেন সমস্ত নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে তদনুযায়ী বিদ্যালয় বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং শিক্ষক বা গুরুদিগকে নূতন আকারে দাঁড়াইতে হইবে, দৃষ্টান্ত না দেখিলে শুষ্ককথায় বা উপদেশে কাহারও প্রাণে তৃপ্তি হয় না বা প্রকৃত চরিত্র গঠন হয় না। ছাত্রেরা স্বভাবতঃ গুরুর চরিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকে সুতরাং গুরুদিগকে তদ্রূপ চরিত্রবান, দৃষ্টান্তপুরুষ হইতে হইবে। প্রাচীনকালে ভারতে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষাকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্রদিগের গুরু গৃহেবাস করিবার ব্যবস্থা ছিল এবং ঐরূপ ব্যবস্থাই ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা কর্ম্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়, তরলমতি ছাত্রেরা সদা সর্ব্বদা গুরুর তত্ত্বাবধানে না থাকিলে চরিত্রগত অনেক দোষ ঘটিতে পারে এবং তাহার দৃষ্টান্তের ও বর্ত্তমান সময়ে বিন্দুমাত্র অভাব নাই। ছাত্রদিগকে কিরূপ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা করাইতে হইবে তাহার ব্যবস্থা বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে ছাত্রেরা যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে তজ্জন্য পরিমিত

পুষ্টিকর আহারের বিধান ও নিয়মিত ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হইবে, ছাত্র যাহাতে নিত্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও দান এই সাধারণ ধর্ম্মের সেবক হয় তৎপ্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী, অনলস, মধুরভাষী ও সদালাপী হয় এবং বিনীত ও পাত্র বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপরায়ণ হয় তাহার উপদেশ ও আচরণ শিখাইতে হইবে। ছাত্র যাহাতে নিজ বর্ণোচিত স্বাভাবিক ও সামাজিক কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত, নিয়মিত পালনকারী হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিদ্যারম্ভে ছাত্রকে অগ্রে পদজ্ঞান বা ভাষাজ্ঞান জন্য ভাষার প্রয়োগ ও শৃঙ্খলা বুঝিবার জন্য বর্ণপরিচয়ের পরেই ব্যাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থা, ভাষা শিক্ষা করাইতে হইলে শুদ্ধ ভারতবর্ষের আদৃত সংস্কৃত ভাষা ও বিশেষ বিশেষ স্থানের মাতৃভাষা শিক্ষা দিলেই চলিবে না, যাহাতে অন্যান্য দেশবাসী ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন ভাষা বুঝিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য ভিন্ন ২ দেশের ভিন্ন ২ বা প্রধান ২ ভাষা শিক্ষা করাইতে হইবে, মানুষ মানুষের নিকট আদরের সামগ্রী, মানুষ নিয়ত মানুষের কল্যাণে ব্যাপৃত, মানুষের সখ্যতায় আবদ্ধ থাকিবে, একদেশবাসী মনুষ্য যে অপরদেশবাসী মনুষ্যকে ঘৃণাকরে, তাহাদের ভাষা শিখিতে অনিচ্ছুক হয়, ইহা অতি সঙ্কীর্ণহৃদয়ের ও নীচতার পরিচয়। ভাষাজ্ঞানে বুৎপত্তি জন্মিলে পদার্থজ্ঞান বা বিচারশাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করাইবার ব্যবস্থা, পদার্থজ্ঞানের শাস্ত্র দর্শণ বা বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞান সাহায্যে জ্যোতিষ, চিকিৎসা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা, কৃষি শিল্প বাণিজ্য এবং ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা হইয়া থাকে ও পরিশেষে পদার্থজ্ঞান সমাধান ও কর্ম্মমীমাংসার পর আত্মতত্ত্ব বিচার বা ব্রহ্মমীমাংসা। এই বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কালে বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যাবতীয় বিদ্যা ও কর্ম্মই শিক্ষা করিতে হইবে, সংসারাশ্রম কেবল শিক্ষার কর্ম্মক্ষেত্র। এই কালেই রাজারধর্ম্ম, প্রজারধর্ম্ম, (আইন কানুন) গৃহীর কর্ত্তব্য, সমাজের কর্ত্তব্য, স্বজাতিবাৎসল্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও উপদেশ বুঝিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা করাইতে হইলে বর্ণোচিত বিদ্যা ও কর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে এবং তদ্রূপ অধিকারভেদে বিদ্যা ও কর্ম্মশিক্ষা না করাইলে সমাজ ও দেশ পুষ্ট ও উন্নতিশীল হইতে পারেনা। যেমন বর্ণানুযায়ী বিদ্যা ও কর্ম্মশিক্ষা করাইবার ব্যবস্থা তেমনই শিক্ষক বা গুরুরও বিচার রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে ক্ষত্রিয়গুরু, ক্ষত্রিয়ের অভাবে বৈশ্য ও বৈশ্যের অভাবে শূদ্রগুরু করিবার ব্যবস্থা। পরন্তু বিদ্যা যে জাতির যে বর্ণের নিকটেই থাকুকনা কেন তাহা গ্রহণ করিবার নিষেধবিধি হইতে পারেনা বরং

সাহেবে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে: যেরূপ দেশের অবস্থা, দিবসাদি ও ঋতুর পরিমাণ, জলবায়ুর অবস্থা এবং বর্ণোচিত অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা তাহাতে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠের নিরূপিত কাল পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দুইবার নিরূপণ করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ পাঠাভ্যাসের নিরূপিত কাল নির্ণয় না হওয়া হেতু অধিকংশ ছাত্রদের স্বাস্থ্য একেবারে আজীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং বর্ণোচিত আচার ও ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে। বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগের ও বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল নির্ণয় করিতে হইলে পাঁচ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। আজ্‌কাল্ ভারতে অধিকাংশ লোকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন বা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী এবং যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ও স্ত্রীশিক্ষা চালাইতেছেন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী ভারতীয় স্ত্রীজাতির অনুকূল নয়, স্ত্রীশিক্ষা একান্ত আবশ্যক, স্ত্রী সংসারের প্রধান সহায় অথবা স্ত্রী না হইলে সংসারাশ্রমের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারেনা। আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সংসারাশ্রমে স্ত্রী পুরুষের তুল্য প্রয়োজন। স্ত্রীযুক্ত পুরুষ না হইলে তাহাকে সংসারী বা গৃহীই বলা যায় না (ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে)। স্ত্রী সন্তান সন্ততির গর্ভধারিণী, স্ত্রীজাতিই মানব জগতের প্রসবিত্রী। সৃষ্টিসংবর্দ্ধনে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর গুরুত্ব পরিচয় তাই আর্য্যশাস্ত্রে জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা গর্ভধারিণী মাতা অধিকতর পূজনীয়া। পুরুষের স্বাভাবিক আশক্তি, প্রীতি স্ত্রীতে, স্ত্রীমূর্ত্তি যেন পুরুষের চক্ষে দিবারাত্রি আনন্দপ্রতিমা, স্ত্রীলোকেরই উপর সংসারাশ্রমের প্রায় সমস্ত কর্ত্তব্যভার, সন্তানাদির লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ, পুরুষের সেবাশুশ্রূষার ভার, দেবতার পূজার আয়োজন, অতিথিসৎকারের ভার, পশুপালনের ভার সমস্তই স্ত্রীলোকের উপর। পুরুষ সংসারাশ্রমের আবশ্যকীয় বিষয়ের সংগ্রহসংস্থানকর্ত্তা ও কর্ত্তব্যপালনের উপদেষ্টা কিন্তু স্ত্রীলোকই সংসারাশ্রমের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যবিধানের একমাত্র কর্ত্রী, সুতরাং যথার্থরূপে স্ত্রীশিক্ষা না হইলে স্ত্রীচরিত্র সুন্দর ও বিশুদ্ধরূপে গঠিত না হইলে সংসারাশ্রম সুখকর হইতে পারেনা। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও ক্রম এইরূপ ভাবে বিধেয় যেন স্ত্রীলোকের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য স্ত্রীলোকেই করিতে থাকে এবং এইরূপ শিক্ষাদ্বারা প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীচরিত্রগঠন হয়। স্ত্রীশিক্ষা বুঝিতে-স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখাইয়া পুরুষের মত পণ্ডিত করিতে হইবে, পুরুষের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করাইতে হইবে এইরূপ নয়। বালিকাদিগকে সাধারণতঃ এইরূপ ভাবে ভাষাশিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে সাধারণ সরল শাস্ত্রগ্রন্থ ও চরিত্রসংবলিত

পুরাণাদি পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য নয় কেবল চরিত্র শিক্ষা, স্বভাবগঠন ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ; স্ত্রীলোকের পুরুষের মত দীর্ঘকাল পড়িবার সময় ও সাবকাশ নাই, অল্পসময়ের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের সত্য শৌচ দয়া দানের স্বরূপবোধ ও উক্ত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের আচরণ অভ্যাস করিতে হইবে, সতীত্বের মূর্ত্তি ও সংসারের গৃহলক্ষ্মী সাজিতে হইবে। যেমন অসচ্চরিত্র বিদ্বান অপেক্ষা চরিত্রবান মূর্খও শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শিক্ষিতা অসতী স্ত্রী অপেক্ষা অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যে নিপুণা সতী-স্ত্রী নরক স্বর্গের তারতম্যে শ্রেষ্ঠতমা। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের বল সতীত্ব, বাহিরের রূপ বিনয়, লজ্জাশীলতা, দেহের আচরণ গৃহকার্য্যতৎপরতা, স্ত্রীলোকের ভিতর এই সাধারণ গুণ ও স্বাভাবিক লক্ষণের অভাব হইলেই স্ত্রীলোক আর স্ত্রীসংজ্ঞার উপযুক্ত নয়। স্বাভাবিক গুণাবলিষ্ঠা ও পূর্ব্বোক্ত সাধারণ লক্ষণান্বিতা স্ত্রীলোকেরা আবার শিক্ষিতা বিদূষী হইলে যেন মনিকাঞ্চন যোগের ন্যায় মনোরম দর্শন হয়, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দস্রোত বাড়িতে থাকে। স্ত্রীশিক্ষার যতই উৎকর্ষতা হউক্ না কেন স্ত্রীলোক কিন্তু কখনই পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাব ও স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম নন। সৃষ্টিতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষকে বলবান দেখিয়াই যেন স্ত্রীলোকদিগের উপর অধিকতর করুণা দেখাইয়া আর্য্যশাস্ত্রপ্রণেতা দূরদর্শী ঋষিগণ মানবজগতে স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কে বিবাহব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কোন কালেই স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেন নাই, তাঁহারা বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, স্বামীর পরলোকান্তে পুত্রাধীন থাকিবেন, বিধান করিয়াছেন এবং স্বাধীনতা ঘটিলে পিতৃকুল পতিকুল উভয়কুলই নিন্দিত হয় দেখাইয়াছেন (বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা, ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি ॥ বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥ পিতা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ। এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ॥ ইতি মনু)। আজকাল দেশের দুর্দ্দশা ও সমাজের অধঃপতনের দিনে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিপরীত উদ্দেশ্য বুঝিয়া তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং ঋষিবাক্য যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন—"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রীয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশং। বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে ॥" "পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং। স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ॥" (ইতি মনু)—স্বামিগণ দিবানিশি স্ত্রীদিগকে স্বাধীনভাবে

বিচরণ করিতে না দিয়া সর্ব্বদা প্রিয়ালাপ ও রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত করতঃ আত্মবশে রাখিবেন, সুরাপান, অসৎলোকের সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, পর্য্যটন, অকাল-নিদ্রা এবং পরগৃহবাস এই ছয়টী স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের মূলকরণ। আধুনিক শিক্ষিতা রমণীকুলও যেন স্ত্রীলোকের সীমা অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইতেছেন, সৌভাগ্যের বিষয় এখনও শিক্ষিতা রমণীগণ 'পুরুষ স্ত্রী, পতি পত্নী' এই সাধারণ সংজ্ঞার পার্থক্য কিন্তু উঠাইতে প্রস্তাব বা আন্দোলন করেন নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের বিন্দুমাত্র দোষ নাই, তাঁহাদের এই বিপরীত বুদ্ধি ও অপরিণতসংস্কারের মূলকারণ, তাঁহাদের পিতা মাতা স্বামী বা অভিভাবকগণ, তাঁহাদেরই বিচারবুদ্ধির অভাবে স্ত্রীশিক্ষার বিপরীত উদ্দেশ্য, বিপরীত বিধান হই-তেছে ও তদনুসারে স্ত্রীলোকের সংস্কার ও চরিত্রগঠন হইতেছে। পুরুষেরা যদি স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার ভাব কখন অন্তরে পোষণ করিতেন, স্বাধীনতাসুখ কোন কালে অনুভব করিতেন তবে আর নিজেদের ও স্ত্রীলোকদের এরূপ দুর্দ্দশা, দুষ্মতি দেখিতেন না। স্বাধীনতা বলিতে বাক্যের আড়ম্বর, উন্মত্ত-প্রলাপ ও উদ্ধতস্বভাব নয়, স্বাধীনতা বলিতে স্বজাতীয় রাজার অধীনে বাস করিয়া সকলে সমভাবে লাঠিসোটা তরবারি বন্দুক ধরিতে শিক্ষাকরা নয়, স্বাধীনতা বলিতে মানবোচিত স্বাভাবিক গুণের সেবক ও বর্ণোচিত স্বাভাবিক কর্ম্মের অধীন হওয়া; স্ব ও অধীন শব্দের সংযোগে 'স্বাধীন' হইয়াছে, সুতরাং স্বাধীন বুঝিতে স্বেচ্ছাচারী না বুঝিয়া আচার ও নিয়মপরায়ণ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ভারতবাসীদের না আছে বর্ত্তমান জাতীয় স্বাধীনতা না আছে প্রাচীন আর্য্যজনো-চিত চরিত্রের স্বাধীনতা, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা বিধানের ভাব যদি কাহারও মনে উদয় হয় তবে তদপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে! বালিকা যেদিন স্বাধীন পিতার কন্যা হইবেন, যুবতী যেদিন স্বাধীন স্বামীর স্ত্রী হইবেন, বৃদ্ধা যেদিন স্বাধীন পুত্রের মাতা হইবেন সেই দিন স্ত্রীস্বাধীনতার চরম উন্নতি, সেই দিন আর স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও আবশ্যক থাকিবেনা। পিতাস্বামীপুত্রের স্বাধীনতায় তাঁহাদের আদরসোহাগে নিজেদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনা ও সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিবেন। স্ত্রীপুরুষের স্বভাবসিদ্ধ মিলন প্রবৃত্তি ও নিয়ত মিলন সম্পর্ক, পরস্পর পরস্পরের অধীন, স্ত্রীপুরুষের পৃথক হইয়া থাকিবার যে ইচ্ছা তাহা অসদিচ্ছা ও স্বভাবের ব্যতিক্রম। স্ত্রীলোকের পুরুষের ন্যায় স্বাধীন থাকিবার অবসর কোথায়, স্বাধীন হইলে আর্য্যসংসার যে একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িবে এবং

আর্য্যগৃহলক্ষ্মী স্বেচ্ছাবিহারিণী পিশাচী হইয়া দাঁড়াইবে, আবার উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবিয়া যদি স্ত্রী পুরুষের একেবারে সম্পূর্ণ পার্থক্যই কল্পনা করা যায় তবে মা_লক্ষ্মীদের দাঁড়াইবার স্থল কোথায়। বর্ত্তমান সভ্য স্বাধীনদেশে যে স্ত্রীলোকেরা অনেকেই শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়ান, অনেকে নিজ নিজ জীবনোপায়ের সংস্থান ও সন্তানসন্ততির ভরণ-পোষণের সাহায্য করেন তাহাও কতটুকু স্বাধীনতা ও পুরুষ হইতে কতটুকু স্বাতন্ত্র্যাবস্থান। বিচারকরিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐরূপ স্বাধীনতায় স্ত্রীলোকের জীবনে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিকাংশ সময় ফলিয়া থাকে এবং ঐরূপ স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত ও কোনদেশের কোন জাতির উচ্চবংশের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়না; তাহা হইলেও শেষ আবার মারামারি বাদানুবাদ এই যে স্ত্রীলোকেরা কিন্তু সর্ব্বদা ঘোমটা দিয়া থাকিবে কেন! কেন মুখ খুলিয়া ফাঁকে বেড়াইতে পাইবেনা? তদুত্তরে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে দেশে ঘোমটার ব্যবস্থা আছে সে দেশের স্ত্রীলোকেরা কি ঘোমটা জন্য যন্ত্রনাভোগ করেন, না কি ঘোমটা খুলিয়া দিবার জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন, দিবারাত্রি ঘোমটা দিবারই কি ব্যবস্থা আছে? ঘোমটা ত স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজে দেয়, ঘোমটাত স্ত্রীলোকদের মুখের বন্ধন বা আচ্ছাদন নয়, ঘোমটা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার বাহ্যনিদর্শন। যাহা হউক ঘোমটা লইয়া বিশেষ আন্দোলন বা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দেন না দেন বিশেষ কিছু আসে যায় না; সুতরাং ঘোমটা দিবার রুচি অরুচি স্ত্রীলোকদিগের উপরই নির্ভর থাকিল কিন্তু যদি একান্তই কোন স্ত্রী বা পুরুষের ঘোমটায় নেহাত্ অরুচিই থাকে তবে তাহাদিগকে কবির উক্তিতে বলিতে হয়, স্ত্রীলোক সংসারে সৌন্দর্য্যপ্রতিমা, পাছে বিষময় সংসারের দৃশ্যে, সমাজের প্রখরউত্তাপে, অসত্ লোকের অমঙ্গল বাতাসে সেই লাবন্যমূর্ত্তির মুখচ্ছবি কাতর দগ্ধ বা মলিন হইয়া যায় তাই পুরুষেরা শঙ্কিতচিত্তে তাহাদের সোহাগের সামগ্রী ঘরের বাহিরে যেখানে সেখানে প্রকাশ পাইতে না দিয়া ঘোমটা দিয়া লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়ায়ছন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাপ্রণালী ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরূপিত হইলেও অনেকের মনে স্ত্রীলোকদের দৈহিক বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণজন্য কোনরূপ নিয়মিত ব্যায়াম বা ভ্রমণ ইত্যাদির আবশ্যক কিনা এই প্রশ্নের উদয় হইলে বিচার মীমাংসায় দেখিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগের উপর সংসারের যে কর্ত্তব্যভার আছে তাহাতে তাহাদের দৈহিক বল প্রকাশের কোন কার্য্য নাই, শরীর সুস্থ

সবল ও কর্ম্মকরণের উপযোগী থাকিলেই যথেষ্ট এবং তাঁহারা সংসারের কার্য্যে যেরূপভাবে পরিশ্রম করেন ও আবশ্যক মতে যেখানে সেখানে যাতায়াত করেন তাহাতেই তাঁহাদের সুন্দর স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত দৈহিক বল সংরক্ষিত হয়। স্ত্রীলোক আজীবন পুরুষের অধীন, তাহাদিগকে বাহিরে বা অপরের নিকট কখন বল প্রকাশ করিতে হয়না, তবে যদি তাও কখন হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের মনোবল বা সতীত্ব বলই দৈহিক বল অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। স্থূল দেহের বল অপেক্ষা সূক্ষ্ম মনের বল অধিক, যেমন জড়জগতে মৃত্তিকা যেখানে প্রবেশ করিতে পারেনা সেখানে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জল প্রবেশ করিতে পারে, জল যেখানে প্রবেশ করিতে পারেনা সেখানে সূক্ষ্মতর অগ্নি প্রবেশ করিতে পারে এবং অগ্নি যেখানে প্রবেশ করিতে পারেনা সেখানে সূক্ষ্মতম তাড়িত প্রবেশ করিতে পারে, তদ্রূপ দেহের বল অপেক্ষা মনের বল অধিক, মনের বল অপেক্ষা প্রাণের বল অধিক। যাহাদের কখন মনবল বা প্রাণবলের আলোচনা বিচার, অভ্যাস বা অনুভূতি নাই তাহারাই দৈহিক বলের অভাবে সর্ব্বনাশ বুঝিবেন, কিন্তু মনবলে বা প্রাণবলে বলিয়ান পুরুষ বা বলবতী স্ত্রী কখন দেহবলের অভাব বোধ করেননা এমন কি তাঁহাদিগকে কখন দেহবলের প্রয়োগও করিতে হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত পুরাণ ইতিহাসে নানা স্থানে চিত্রিত হইয়াছে বশিষ্ঠ ঋষির সহিত রাজা বিশ্বামিত্রের যুদ্ধকালীন বিশ্বামিত্রের যাবতীয় সৈন্যবল সমগ্র দেহবল, যাবতীয় সিদ্ধাস্ত্রের বলও বশিষ্ঠের মনোবল বা তপোবলের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল এবং শেষে বিশ্বামিত্রকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে "ক্ষত্রিয় বলে ধিক্ ব্রাহ্মণের বলই শ্রেষ্ঠ" এবং তজ্জন্যই তিনি রাজত্ব ছাড়িয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া ঋষি হইয়া ছিলেন। প্রাণ হইতে মন ও মন হইতে দেহের উৎপত্তি হয়, মনই দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মার সৃষ্টি মানস সৃষ্টি, ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিবার জন্য স্বতন্ত্র কিছু আয়োজন করিতে হয় নাই, কেবল মাত্র সৃষ্টি করিতে মনন করিয়া ছিলেন সুতরাং সৃষ্টি হইল। জীবদেহে মনোময় দেহই ঘুরিয়া ফিরিয়া স্থূলশরীর ধারণ করিয়া বেড়ায়, যতদিন মনোময় শরীরেরধ্বংশ না হয় ততদিন মনোময় দেহের অভ্যন্তরে প্রাণময় পুরুষ মুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে সংযুক্ত হন না, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি পায় না। স্ত্রীলোকের এই মনোবল বা সতীত্বের বল পুরুষের দৈহিক বল অপেক্ষা অধিক প্রবল, কাজেই পুরুষের ধর্ম্মবল অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ধর্ম্মবল অধিক; সতী স্ত্রী অসহায় অবস্থায় পতিতা হইলেও তাঁর সতীত্ব প্রভাবে কোন লোক, কোন

প্রাণীই তাঁহার হিংসা বা সতীদেহ স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। নির্জ্জন বনে একাকিনী সতী দময়ন্তীর দেহ পাপমনা ব্যাধ কিছুতেই আক্রমণ বা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, অন্যের কথা দূরে থাকুক সতী সাবিত্রীর ক্রোড়ে স্থাপিত মৃত সত্যবান দেহ যমকিঙ্করেরাও স্পর্শ করিতে পারেন নাই এবং শেষে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম আসিয়াও সতীর বিনানুমতিতে সত্যবানদেহ (লিঙ্গদেহ) লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। তপঃসিদ্ধ ঋষিবাক্যের ন্যায় সতীবাক্যের অন্যথা হয় না, সতীর অভিসম্পাত অলঙ্ঘনীয়, আর্য্যজগতে ইতিহাস পুরাণে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে সতীত্ব ও সতীবাক্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে যেমন বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে দৈহিকবলে পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বলা করিয়াছেন অন্যদিকে তেমনই মনবলে পুরুষের অপেক্ষা বলবতী করিয়াছেন এবং সিদ্ধির জন্য পুরুষের ন্যায় দুষ্কর তপস্যার বিধান না করিয়া শুদ্ধ স্বামীসেবায় তুল্যসিদ্ধির বিধান করিয়াছেন (নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতঃ। পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে,, মনু) স্ত্রীলোকের মনবল বা সতীত্বের প্রাধান্য বুঝাইবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীলোক দিগকে 'শক্তিরূপা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং শক্তির মাহাত্ম্য বিস্তার জন্য মহিষাসুর শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণ কর্তৃক সমস্ত দেবগণ নিগৃহীত ও হতবল হইয়া অসুর নিধন জন্য আদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ও সেই আদ্যাশক্তিই, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেবগণের তেজ বা শক্তিরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন অথবা পুরুষ প্রকৃতির নিত্যমিলন অভেদশক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীলোকদের দৈহিকবল পুরুষের অপেক্ষা কম্ দেখিয়া সেই বল বৃদ্ধি করিবার জন্য ছটফটানির কোন কারণ নাই এবং ঐরূপ সঙ্কল্প বা কল্পনা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষেই আকাশকুসুম কল্পনা বুঝিতে হইবে। স্বভাবের বিকার ভিন্ন সম্পূর্ণ গতিরোধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই, স্ত্রীলোক দিগকে যেরূপ ভাবেই গঠিত বা চালিত করা যাক্ না কেন মোটের উপর সৃষ্টিতে স্ত্রীলোকেরা চিরকালই পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বলা সুতরাং পুরুষের অধীনা থাকিবেন। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমগ্র প্রাণী জগতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলবান। তজ্জন্য স্ত্রীলোকের দেহবল বিধান বা সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে পুরুষের সঙ্গে স্পর্দ্ধা না করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও বল ভিন্নদেশের ভিন্নজাতীয় স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্য ও বলের তুলনায় সুন্দর ও অধিক হয় তাহার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সে চেষ্টার ও ব্যবস্থার ভারও স্ত্রীলোকদের

নয়, স্ত্রীলোকদের রক্ষক পুরুষদের সেই ভার বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন২ সমাজের স্ত্রীলোকের ভিতরও কখন দৈহিক বল বিক্রম দেখাইবার স্পর্দ্ধা করিতে হয় নাই ও হইবেও না. সেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের বল বিক্রম বুঝিতে নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ বর্ণ বা জাতির, নিজ ২ পতিপত্নীর উপযুক্ত বল বিক্রম আছে কি না তাহাই বুঝিতে ও বিচার করিতে হইবে এবং সে বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের নিজ ২ স্বামী বা অবিভাবকগণই যথার্থ উপদেষ্টা ও স্ত্রীলোকেরা নিত্য তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। স্ত্রীলোকদের এই বিদ্যাভ্যাস ও কর্ম্মশিক্ষার কালে যেমন যথাকর্ত্তব্য বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য ও নিয়মিত বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তদ্রূপ বালক বা পুরুষের ন্যায় যাবতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মও শিক্ষা করিতে হইবে। পিতা মাতার, ভাইভগিনীর, স্বামীর, শ্বশুরশাশুড়ীর, পুত্রকন্যার, পিতৃকুল ও পতিকুলের অন্যান্য আত্মীয়ের ও অতিথির প্রতি কিরূপ ব্যবহার ও আচরণ করিতে হইবে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই শিক্ষা করিতে হইবে। গৃহমার্জ্জন, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রন্ধন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সেবাশুশ্রূষা, সন্তান সন্ততির লালনপালন, দেবসেবা, অতিথিসেবা, পশুপালন প্রভৃতি সংসারাশ্রমের যাবতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিখিতে হইবে. ধাত্রীবিদ্যা, সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা, চন্দ্রসূর্য্য ও প্রধান ২ গ্রহনক্ষত্র এবং তিথি সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্যোতির্বিদ্যা, এবং বর্ণোচিত জীবিকাবৃত্তি বিষয়ে গৃহকার্য্যের অবসরান্তে, পুরুষের আংশিক সহায়তাজন্য অথবা সন্তান সন্ততির বা পরিবারবর্গের সাহায্য ও উপকারার্থে স্ত্রীলোকেরা নিয়মিতরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা করিবেন এবং পুরুষের ন্যায় অনলস ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন। আজ্‌কাল্‌ পুরুষদের সাধারণ জীবিকাবৃত্তি চাকুরীবৃত্তির দিনে তাঁহাদের স্ত্রীগণ অধিকাংশই কিম্ভুতকিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, গৃহকার্য্যের অবসরান্তে কোনরূপ কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যের আলোচনা ও অভ্যাস একেবারেই নাই, অবসর পাইলেই নিদ্রা অথবা আমোদ প্রমোদ কিম্বা অসদালাপে সময় কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি আবার গুণবতী হইয়াছেন তিনি বড়জোর নাটক নভেল বা অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া সময় কাটাইতেছেন, আবার চাকুরীজীবি সহরবাসী পুরুষদের সহরবাসিনী স্ত্রীদিগের মধ্যেত অধিকাংশই এক্ষণে যেন বিগ্রহরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের কোমলাঙ্গকে আর গুরুতর রন্ধনকার্য্যের জন্যও কষ্ট পাইতে হয়না, দিবারাত্রি সন্তান সন্ততির লালন পালনে ও ক্লিষ্ট হইতে হয় না। উন্নতজীবন

চাকুরীজীবি স্বামী মহোদয়েরা অনেকেই এখন স্ত্রীদের রন্ধনের কষ্ট নিবারণ জন্য পাচকব্রাহ্মণ ও সন্তানাদির লালনপালন জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়েছেন, শতকরা ২১ জন আবার কিজানি কি মনে করিয়া পাচকের পরিবর্ত্তে পাচিকাও নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং ঐ সকল স্ত্রীলোকদের আর এখন সোহাগের সীমা নাই, কার্য্যের অভাব নাই, দিবারাত্রি অবসর নাই, সর্ব্বদাই অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, বসনভূষণের জাঁকজমক ও আমোদ আহ্লাদের ফোয়ারা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, আহা, স্ত্রীলোকদের ঐরূপ আচরণ জন্যই যেন তাহাদের প্রীতি উদ্দেশে এখনকার অধিকাংশ হতভাগ্য স্বামীরা, অন্তরে বলনাই, পেটে অন্ন নাই, মুখে বাক্য নাই তথাপি দ্বারে দ্বারে দিবারাত্রি দাসত্ব বা চাকুরীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! আ-মরি মরি, নিত্যমুক্ত মহাযোগী মহাদেবও যখন আদ্যাশক্তি জগদম্বিকাকে লইয়া সংসারের অভিনয় করিয়াছেন তখন ব্রহ্মাণ্ডজননী ভগবতীও রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা সাজিয়া স্বহস্তে অন্ন প্রস্তুত করতঃ আদিদেব মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীকে অন্নদান করিয়া ছিলেন। আর আমাদের মহাপুরুষেরা মালক্ষ্মীদিগকে লইয়া সংসার করিয়া আগেই লক্ষ্মীদের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত বা রন্ধনের কষ্ট মোচন করিতে ব্যগ্র হইয়া বসেন। হায়, কতদিনে আবার অধঃ-পতিত পুরুষদের চৈতন্য হইবে, কতদিনে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে! কতদিনে দাসত্বজীবি পুরুষেরা তাহাদের স্ত্রীদিগকে আর প্রভুপত্নী না সাজাইয়া দাসপত্নী সাজিবার উপদেশ দিবেন, কতদিনে আবার পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছাচারিণী ঘুচাইয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণী করিয়া লইবেন। পতিপত্নীর বিপরীত দৃষ্টান্তে অনেক সময় বিচারপরায়ণের অন্তঃকরণ দুঃখে যেন ফাটিয়া যায়, আক্ষেপে যেন জলিয়া উঠে, স্বামী প্রবাসে দূরদেশে বহুকষ্টে নারীবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি পাচক বা দাসের কার্য্য করিতেছেন অথচ তাহার বাড়ীতে তার স্ত্রীর অঙ্গরাগের ব্যবস্থা বসন ভূষণের সৌন্দর্য্য আমোদ আহ্লাদের কথা, পদমর্য্যাদার অহঙ্কার অভিমান দেখিয়া অবাক হইতে হয়। হরি হরি, কতদিনে আবার হতভাগিনী অধোগামিনী স্ত্রীগণ রাজমহিষী শৈব্যার ন্যায় স্বামীর দুঃখ মোচন জন্য পরগৃহে আত্ম বিক্রয় করিতে সম্মতা হইবেন, পাছে স্বামী রাজা হরিশ্চন্দ্রের দাসত্ববৃত্তি চক্ষে দেখিতে হয় ভাবিয়া সাধ্বী শৈব্যা অগ্রেই দাসীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কতদিনে স্ত্রীলোকেরা শৈব্যার আদর্শের অনুসরণ করিবেন! কতদিনে স্ত্রীলোকেরা আবার ঋষিবাক্যের অনুগামিনী হইয়া অহরহঃ স্মরণ রাখিবেন "নির্দ্দিনঃ কাম-

বৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ। উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ॥" (মনু) পতি দুর্বৃত্ত, লম্পট ও গুণহীন হইলে ও সাধ্বী স্ত্রী, পরম আরাধ্য দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন, কবে আবার স্ত্রীলোকেরা পতিব্রতার লক্ষণ নিত্য স্মরণ করিয়া চরিত্রে লক্ষণ জীবন্ত ও প্রকাশমান দেখাইতে সচেষ্ট হইবেন, "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" স্বামী কাতর হইলে যে স্ত্রী কাতরা হন, স্বামী হৃষ্ট হইলে যে স্ত্রী আহ্লাদিতা থাকেন, স্বামী প্রবাসে থাকিলে যে স্ত্রী মলিনা ও কৃশা হন এবং স্বামী মরিলে যে স্ত্রী মরিয়া যান সেই স্ত্রী যথার্থ পবিত্রতা। বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার বলে যাহাতে স্ত্রীলোকদের যথার্থ আত্মদৃষ্টি হয় যাহাতে যথার্থ সংসারের গৃহিনী হন, গুণবান পুত্র, গুণবতী কন্যার জননী হন, বৈরাগ্য দশায় স্বামীর সহধর্ম্মিণী হন অথবা সুপুত্রের জননী হইয়া সংসারে দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা থাকেন অথবা দৈবাৎ বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারিণী হইয়া সংসারকর্ত্তব্যের অবসরকাল ভগবদুপাসনায় কালাতিপাত করেন এবং বৈরাগ্য দশায় অগ্রে স্বামীর দেহান্ত হইলে তপস্বিনী হইয়া মৃত্যুকাল অপেক্ষা করিতে থাকেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রীচরিত্র গঠন করিতে হইবে। পাঠদশায় বা কর্ম্মশিক্ষার সময় বালক বা পুরুষকে যদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে হয় তদ্রূপ স্ত্রীলোকদিগকেও সংসারাশ্রমের পর স্বামীর বৈরাগ্যজীবনে কিরূপে স্বামীর সহগামিনী বা সংসারে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মোপাসনার ব্যবস্থা নাই, স্ত্রী স্বামীরই ধর্ম্মের বা উপাসনার নিত্য অনুগামিনী হইবেন। আর্য্যজগতে স্ত্রীলোক পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সংসারের গৃহিনী সুপুত্রের জননী সুতরাং স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষিতা ও সুচরিত্রা না হইলে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যত কোন কালেই গৃহের বা দেশের কোন ক্রমেই মঙ্গল বা উন্নতির আশা নাই।

সংসার, কর্ম্মজীবন।

(গার্হস্থ্যাশ্রম)।

সংসার বা গার্হস্থ্যাশ্রমের নিরূপিত কাল পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত। এই গার্হস্থ্যাশ্রমের আরম্ভকাল ধরিতে হইলে স্ত্রী পুরুষের

বিবাহ হইতে ধরিতে হয়, বিবাহই সংসারের প্রবেশ দ্বার। প্রাচীনকালে আর্য্যভূমে দ্বিজাতি বালকেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কালে আচার্য্য বা গুরুগৃহে যাবতীয় বিদ্যা ও কর্ম্মশিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিলে গুরুর অনুমতিক্রমে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে অর্থাৎ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতেন। বিবাহ দ্বিজাতিদিগের দশসংস্কারের শেষ সংস্কার এবং শূদ্রদিগের একমাত্র সংস্কার। এক্ষণে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সংস্কারগুলি যেন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সংস্কারের নাম আছে, গ্রন্থের ভিতর বা পুরোহিতের মুখে মন্ত্র আছে, কালে কালে নাম ধরিয়া কার্য্যও আছে, কিন্তু সংস্কারের উদ্দেশ্য কি মন্ত্রের মর্ম্ম কি, সংস্কারের ফল কি, তাহা কোন সংস্কৃত বালক বা পুরুষ বালিকা বা স্ত্রী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা সুতরাং তদ্রূপ কার্য্যে যথার্থ ফলভাগী হয়না। সংস্কারের সাধারণ অর্থ দোষশুদ্ধি, গর্ভাবস্থা হইতে মনুষ্যদেহে সাধারণতঃ সময়ে সময়ে যে দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা তাহার শুদ্ধির নাম সংস্কার, এবং যেমন মলিনতার অন্তে পরিষ্কারিতা, দোষের অন্তে গুণের প্রয়োজন তদ্রূপ সংস্কারের দ্বারা দোষ দূর করিয়া গুণের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দ্বিজাতিদিগের সংস্কারগুলির মন্ত্র ও কার্য্য দেখিলে ঐরূপ সাধারণ অর্থ ও উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে যেমন তাহার দোষগুণ আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক এবং নিয়মিতরূপে কার্য্য না করিলে যেমন ফললাভ হয়না বা বিপরীত ফল হয়, তদ্রূপ সংস্কারের বিধান সংস্কারকর্ত্তার বা সংস্কৃত বালক বালিকা বা স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ঙ্গম না হইলে সংস্কারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না সুতরাং যথার্থ ফললাভ আর কিরূপে হইবে! আজকাল যাঁহারা সংস্কার লোপ করিয়াছেন তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহারা সংস্কার বজায় রাখিয়াছেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই যেন সংস্কারগুলিকে একটা চাল বা প্রথা বলিয়া বঝিয়াছেন এবং 'উঠাইয়া কাজ নাই' 'করে দোষ নাই' যেন এইরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন। দুঃখের বিষয় যাঁহারা সংস্কার লোপ করিয়াছেন অথবা চাল বা প্রথা বলিয়া অনুবর্ত্তন করিতেছেন তাঁহাদের হাজার প্রতি ৯৯৯ জনই হয়ত জীবনে কখন সংস্কার কি, সংস্কারের মন্ত্র কি, মর্ম্ম কি, সেদিকে দৃষ্টি বা আলোচনা রাখেন নাই, অথচ না দেখিয়া না পড়িয়া না বুঝিয়া কিন্তু সংসারের সমালোচনায় বিদ্যাবাগীশ, আধুনিক শিক্ষিত সারগ্রাহী অনেকেই আবার সংস্কার, শ্রাদ্ধ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ব্রত যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের অর্থাগমের কৌশল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,

ইঁহাদের বড় দোষ নাই, কেননা এইরূপ কুতর্ক ও নীচাসিদ্ধান্তের মূলকারণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও পুরোহিত সম্প্রদায়, অধিকাংশ পুরোহিতই এক্ষণে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বা যত্‌সত জ্ঞানহীন, মূর্খ, লোকপ্রতারক ও আত্মবঞ্চক সুতরাং যজমানেরাই বা তদনুরূপ শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুতার্কিক ও দোষদর্শী না হইবে কেন! ছাত্র অপেক্ষা আচার্য্যের গুরুত্ব, শিষ্য অপেক্ষা গুরুর গুরুত্ব, ও যজমান অপেক্ষা পুরোহিতের প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ থাকা চাই, ইহার অভাব হইলেই সম্পর্কের স্থায়িত্ব হয়না, সুতরাং "যাকে ভালবাসিনা তার কাজও ভাললাগেনা" পুরোহিতকে অপদার্থ অমানুষ দেখিলেই পুরোহিতের কোন কাজও ভাললাগেনা বা দেখিতে ইচ্ছা হয়না, হাজার তাহাতে নিজের গুপ্ত স্বার্থ থাকুক না কেন, কারণ স্বার্থত বুঝাইবেন পুরোহিত, পুরোহিতের বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং বুঝিবেই বা কে! পুরোহিত সম্প্রদায়! যখন পৌরহিত্য ভিন্ন জীবিকার উপায়ান্তর নাই, যখন যজমানের দুয়ারে দুই বেলা না গেলেই নয়, যখন মুখে দিবারাত্রি যজমানের মঙ্গলকামনা করিতে হয়, যখন যজমানের অনাদর বা অভক্তি দেখিলে মনে ২ কষ্ট ও রাগ হয়, তখন যাহাতে যজমানের যথার্থ মঙ্গল হয়, যাহাতে যজমান নিয়ত সেবা ও ভক্তিপরায়ণ থাকেন তদ্রূপ চরিত্রের সাধন ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই ভাল হয় নাকি? এবং যজমানকুল! যাহারা একেবারেই পুরোহিত বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই, অনিচ্ছা অতৃপ্তি সত্বেও যখন পুরোহিতের মতানুসারে কার্য্যই করিতে হয় তখন মনঃসংযোগ করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয় নাকি! চোরের উপর রাগ করিয়া পাত্রাভাবে মাটিতে মাটিমিশ্রিত ভাত না খাইয়া অন্নপাত্রের পুনঃসংস্থান করিয়া তদুপরি বিশুদ্ধ অন্ন ভোজন করিলে ভাল হয় নাকি? পুরোহিতকে অনুপযুক্ত দেখিলে উপযুক্ত পুরোহিত দ্বারাই কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করান উচিত, অথবা পুরোহিত যাহাতে উপযুক্ত হন ও নিয়মিত কার্য্য করান্ তাহার চেষ্টাকরা উচিত, অনেকসময় পুত্রের দ্বারাও পিতার ভ্রমদূর ও চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। সকলেরই অগ্রে আত্মদৃষ্টি রাখা ও স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা করা উচিত, পশ্চাৎ অন্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে ও তাহার কর্ত্তব্যের সমালোচনা করিতে হয় এবং সকলকেই নিয়ত বিচারপরায়ণ হইতে হয়। যাহা হউক আমরা এক্ষণে গার্হস্থ্যাশ্রমের মূলভিত্তি 'বিবাহ' বলিতে কি বুঝি তাহার আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে। বিবাহ বলিতে পশুবৎ যথেচ্ছানতে, বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে, যে কোন সময়ে, যে কোন স্ত্রীতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা নিবারণ জন্য,

সমাজশৃঙ্খলা সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে, সন্তান উৎপাদন ও সন্তানসন্ততির লালনপালন জন্য স্ত্রীলোকের পুরুষের সহায়তা প্রাপ্তিজন্য স্ত্রী পুরুষের স্থায়ী পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন নয়; বিবাহ বলিতে আর্য্যশাস্ত্রের বিবাহ সংস্কারের দুই চারিটি মন্ত্র আলোচনা করিলে বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য ও অর্থ উপলব্ধি হইবে "ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ তে ভবা গ্রন্থি নিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমারযুগল প্রভৃতি সকলে এই গ্রন্থি-নিলয় অনন্তকাল ধারণ করুন। ঐটী হস্তবন্ধনের মন্ত্র, ঐ মন্ত্রে স্পষ্টই বুঝাযায় যে পতি পত্নীর সম্বন্ধ অনন্ত কালের জন্য, পরস্পর উপকার প্রত্যুপকারের ব্যবস্থায় জীবমানে দিন কতকের জন্য নয়, বিবাহ কালীন জামাতা কামস্তুতি পড়েন "ওঁ কইদং কস্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতি-গৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।" এইটী কি? এইটী কার? কে কাহাকে সম্প্রদান করিল? কামই কামকে প্রদান করিয়াছে, কামই দাতা, কামই ইহার প্রতিগৃহীতা, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে, কামের সহায়েই আমি গ্রহণ করিতেছি হে কাম! এইটী তোমারই এই কামস্তুতিতে যে কামের স্তুতিকরা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই মানুষের ইন্দ্রিয়জনিত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা নয়, যে ইচ্ছা বা প্রেরণার বশে স্ত্রী, পুরুষের সম্মুখে পত্নীরূপে আনিতা হইয়াছে, যে ইচ্ছাতে পতিপত্নী নিত্য সংযুক্ত থাকে ও যে ইচ্ছায় পতি-পত্নীর সম্বন্ধ পরকালেও বিচ্যুত হয় না, যে ইচ্ছা বা কাম যাবতীয় সৃষ্টির আদিবীজ ও সৃষ্টির স্থিতিধ্বংশে যে ইচ্ছারই একমাত্র খেলা সেই অনাদি কাম বা ভগবদ্‌প্রেরণার স্তুতি বুঝাইতেছে অর্থাৎ পতিপত্নীর মিলনে মানুষের কোন ইচ্ছা বা কৃতিত্ব নাই, তাই বিবাহে মনুষ্য সমাজের কাহারও প্রশংসা বা স্তুতিবাদ না করিয়া অনাদি কামের স্তুতি করা হইয়া থাকে! এই ত গেল বিবাহের মূলসূত্র, ইহার পর বিবাহের উদ্দেশ্য কি ও স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ও প্রতিপাল্য কি, তাহা দেখাইবার জন্য শাস্ত্র ও মন্ত্র বলিতেছেন "ওঁ প্রমে পতি যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং" আমার পতি আমার জন্য পথ প্রস্তুত করুন যাহাতে আমি সুখে ও নিরাপদে গমন করিতে পারি। "ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ ত্রীণিব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যান্তে গমেয়ং, সখ্যান্তে মা যোষাঃ সখ্যান্তে মায়োষ্ঠ্যাঃ।" বিষ্ণু অর্থলাভার্থ একপদ অতিক্রম করাউন, বললাভার্থ দ্বিতীয়পদ

পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির জন্য তৃতীয় পদ, সৌখ্যপ্রাপ্তি জন্য চতুর্থ পদ, পশুলাভার্থে পঞ্চম পদ, ধন প্রাপ্তি জন্য ষষ্ঠপদ ও ঋত্বিকলাভার্থ সপ্তপদ অতিক্রম করাউন, পূর্ব্বোক্ত সপ্তউদ্দেশ্য সাধন জন্য তুমি আমার সখা ও সহচারিণী হও, আমি তোমার সখ্যপ্রাপ্ত হইলাম, অনিষ্টকারিণী স্ত্রীলোকেরা যেন তোমার সখ্য বিচ্ছিন্ন না করে, হিতৈষিণী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যেন তোমার সখ্য হয়। "ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥" হে কন্যাকে বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন; জল দেবতাগণ বায়ু, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবী ইঁহারা সকলে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন, পানিগ্রহণের মন্ত্র:—"ওঁ গৃভ্ণামিতে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগোহর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।" ওঁ অঘোর চক্ষুরপতিঘ্নেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্জীব সূর্দ্দেবকামা স্যোনা শংনো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥" হে কন্যকে। ভগ, অর্য্যমা সবিতা ও পুরন্ধি এই সকল দেবতারা তোমাকে আমায় সম্পর্ণ করিয়াছেন, তুমি আমার গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তুমি সৌভাগ্যোৎপাদনার্থ জরাবস্থা পর্য্যন্ত আমার সহিত অবস্থান কর, আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি। হে কন্যে! তুমি ক্রূরদৃষ্টি ও পতিঘাতিনী না হইয়া অবস্থান কর, গো মহিষাদি পশুগণের সুখবিধাত্রী হও, তুমি প্রসন্নমানসা, তেজস্বিনী, বীর প্রসবিনী, জীবদপত্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞাদিরতা, সকলের সুখকারিণী আমাদের কল্যাণকরী ও গবাদিকায়কল্যাণকারিণী হও। "ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাংভব ননন্দরি চ সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥" হে কন্যকে, তুমি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননান্দৃ ও দেবর ইহাঁদের নিকট সাম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ ইহাদের নিকট সকল কার্য্যে প্রধানা হইয়া সকলের মনরঞ্জন করিতে থাক। "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং ॥" হে কন্যে! তুমি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে স্থাপনকর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর, তুমি অনন্যচিত্তে আমার বাক্য পালনকর, বৃহস্পতি তোমাকে আমার প্রীতিবিধানার্থ নিযুক্ত করুন। পূর্ণাহুতির দ্বারা দোষ শুদ্ধির মন্ত্র:—"ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥

ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥ ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভি রাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা॥"হে কন্যে! তোমার দেহস্থ লোমসন্ধির মূর্দ্ধাস্থানে, নেত্রপক্ষ্মে এবং আবর্ত্তে অর্থাৎ ছিদ্রস্থানে বা হৃদ্বারে যে সকল অলক্ষণ বা দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই সকল দোষ উপশমিত করিলাম। তোমার কেশে, নেত্রে ও অশ্রুবিমোচনে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতির দ্বারা সমস্ত উপশমিত করিলাম। তোমার স্বভাবে, বাক্যে ও হাস্যে যে সকল দোষ আছে আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। তোমার দন্ত মধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। তোমার উরুদ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে ও জঙ্ঘাসন্ধিতে যে সকল দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গে অন্যান্য যে কোনরূপ দোষ আছে, আমি পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম। "ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং।" হে ধ্রুব! তুমি যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছ, আমিও যেন সেইরূপ পতিগৃহে স্থিরা হইয়া থাকি! "ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি"। হে অরুন্ধতি! আমি তোমার ন্যায় যেন কায়মনোবাক্যে পতির অনুবর্ত্তিনী থাকি। ওঁ ধ্রুবাদ্যৌ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে॥ "দ্যুলোক, পৃথিবী, সচরাচর এই জগৎ এবং পর্ব্বত সকল যেমন স্থির, এই স্ত্রীও সেইরূপ পতিকুলে স্থির হউক। ওঁ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা, বধ্নামি সত্য-গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে॥" হে বধূ! অন্নরূপ পাশ ও মণিবৎ প্রাণসূত্র দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা আমি ত্বদীয় হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি। "ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ংমম, যদিদং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক অর্থাৎ আমরা উভয়ে এক হৃদয় হই।

সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে আগে যথার্থ গৃহিণী বা স্ত্রীর দরকার অর্থাৎ ভাল করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহ ভাল না হইলে সংসার আর ভাল হইবে কিরূপে। আগে স্বামী পরে স্ত্রী। তারপর স্ত্রীপুরুষের মিলনে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি, সুতরাং প্রথমে স্বামী ভাল

হওয়া চাই, তদনুরূপা স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ হইলে অনুরূপ পুত্র কন্যাও জন্মগ্রহণ করিবে। বিবাহে আর্য্যশাস্ত্রে জামাতাকে বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বরের অর্থ বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ, সম্প্রদাতা বা কন্যাকর্ত্তার পূজার সামগ্রী। "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" মন্ত্রে জামাতার প্রতি ভবৎ শব্দের প্রয়োগে জামাতার কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। শাস্ত্রানুসারে জামাতা নির্ব্বাচন করিতে হইলে জামাতা শ্বশুর অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বংশ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইবেন, বয়সের কোন নিয়ম নাই, কেননা দ্বিজাতিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়েরা বলজ্যেষ্ঠ এবং বৈশ্যেরা ধনজ্যেষ্ঠ বলিয়া শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার ওপরিচয় হয়; শূদ্রেরা কেবল বয়সের আধিক্যে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। আজকাল্ জামাই নির্ব্বাচনের পদ্ধতি পড়িয়াছে—জামাইএর যেন অল্পবয়স হয়, রংটী যেন পরিষ্কার হয়, বিদেশীয় লেখাপড়ায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, কোন্ কোন ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, জামাইএর বাবা কিরূপ চাকুরী করে, কিছু নগদ সঞ্চয় বা জমি জায়গা আছে কি না। আবার যাঁহারা কুলীন সন্তান বলিয়া পরিচিত ও অদ্যাপিও কৌলিন্যের অধীন আছেন তাহাদের ও আর যথার্থ কৌলিন্যের বিচার নাই অথচ কুলীন বলিয়া বড় অভিমান কুলীন জামাই করিবার বড়ই আস্ফালন কিন্তু কুলীনের কোন ধারই ধারেন না। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥" কুলীনের এই শাস্ত্রীয় নবধা লক্ষণের ভিতর রূপের বা ধনের কথার কোন উল্লেখ নাই, শাস্ত্রে যে দুটিকে লক্ষণ হইতে বাদ দিয়াছেন, সমাজ এক্ষণে সেই দুটিকেই একমাত্র কুলীনের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য কেহ যেন প্রতিষ্ঠা বা বৃত্তি শব্দের কুব্যাখ্যায় ধনের কথা টানিয়া না আনেন, প্রতিষ্ঠার সাধারণ অর্থ স্বপদে অবস্থিতি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ অর্থে যিনি আপন পদমর্য্যাদা লঙ্ঘণ করেন না; এবং বৃত্তি বলিতে চাকুরী না বুঝিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত বৃত্তি বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের কুলীনের পরিচয়—পূর্ব্বপুরুষদের বা আদি পুরুষের নামের জের আছে কি না, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধি, যেরূপই হউক না কেন, জামাই নির্ব্বাচনের ত এই অবস্থা। কন্যা নির্ব্বাচনের পদ্ধতিও অবিকল তদনুরূপ, কন্যাটী দেখিতে সুন্দরী হইলেই হইল এবং কিছু ২ লিখিতে পড়িতে পারিলেই ভাল হয় আর কন্যার পিতা বরের পিতার দাবীমত অর্থ অলঙ্কার দানে যেন অসমর্থ না হয়। "বিষাদপ্যমৃতং-গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং। নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" এই

সাধারণ নীতিবাক্যও কোন বরকর্ত্তার মনে এখন উদয় হয় না। তদনুসারে কার্য্য করার কথা দূরে থাকুক এবং "কোকিলাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতং। বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিণাং॥" এই অকাট্য প্রত্যক্ষ বাক্যেরও কেহ এখন আলোচনা বা চরিত্রে অভ্যাস করে না। তাই বলি যখন জামাই কন্যা নির্ব্বাচন বা বিবাহের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তখন আর সেই জামাই কন্যার মিলনে সুন্দর ও পবিত্র সংসার উৎপন্ন হইবে কিরূপে, সেই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এখন আর্য্যসংসার যথার্থ আর্য্যসংসার করিতে হইলে সমস্ত বদলাইতে হইবে, অথচ সে বদলানও বড় কঠিন কথা নয়, সাধারণ লোকের সদসৎ বিচার বুদ্ধিরই উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজ ২ কর্ত্তব্যপালন ও সদ্বিচারে সচেষ্ট হইলে, আগে ভারতোদ্ধার করিবার কল্পনা বা চেষ্টা না করিয়া আত্মোদ্ধার জন্য প্রাণপণ করিলে একদিনেই ভারতোদ্ধার হয়, ভারতভূমি আবার পূর্ব্ববৎ আর্য্যভূমি হয়। সুতরাং প্রত্যেক বালক বালিকা বা পাঠক পাঠিকাকে বিদ্যা শিক্ষার কালে বিবাহের পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবাহটী পড়াইতে হয়, যে যেরূপ ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহাকে তদ্রূপ ভাষায় পড়াইতে হইবে, বিবাহ লইয়াই যখন সংসার, তখন বিবাহের উদ্দেশ্য, সংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হওয়া চাই। বিবাহের পর সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারের কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য পালনের সময় অহরহঃ ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে, সমস্তই ভগবানের আদেশ, যাবতীয় কার্য্যই ভগবানের কার্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যেমন জীবের সৃষ্টি স্থিতি বৃদ্ধি ও বিনাশ সাধিত হয় তদ্রূপ ভগবানের আদেশেই মানুষকে কর্ত্তব্য বোধে সংসারের কার্য্য করিতে হয়। স্বামী স্ত্রী লইয়া প্রথম সংসার আরম্ভ হয়, স্বামীর উপর সংসারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যভার ও স্ত্রীর উপর কতকগুলি কর্ত্তব্যভার, শুদ্ধ স্বামী স্ত্রী লইয়াই সংসারের কর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে বিবাহের মন্ত্র কএকটী দ্বারাই সে কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এক্ষণে আর্য্যযুবকের বিবাহ করিয়া সংসার প্রবেশের সময়, তাঁহার সংসারে আরও অনেক পরিবারবর্গ থাকেন, পিতামাতা, ভাই ভগিনী, খুড়া খুড়ী প্রভৃতি অনেক নিকট ও অন্যান্য দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে একান্নভুক্ত হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য করিতে হয়। অতএব তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিচার ও কর্ত্তব্য শিখিতে হইবে। প্রথমতঃ জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতার প্রতি কর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে যাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সংসারে আসিয়াছি,

যাঁহাদিগকে জনক জননী পালক পালিকা করিয়া ভগবান পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আপনার বলিতে, স্নেহের বলিতে, শ্রেষ্ঠ বলিতে, আর সংসারে কে আছে? পিতামাতা সংসারে জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবতা, জগৎপিতা জগৎমাতার যেন অভিন্নমূর্ত্তি, পুত্রকন্যার প্রতি পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা, সহিষ্ণুতা লালন পালন ও নিয়ত কল্যাণ কামনা দেখিয়া শিবশক্তির অপার-করুণা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা, তাঁদের সেবা শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা বুঝিতে হইলে তাঁহাদিগকে দেহধারী মূর্ত্তিমান শিবশক্তি জ্ঞান করিতে হইবে. দিবারাত্রি তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, নিয়ত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিলে, আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে কোন অমঙ্গল বিপদেরই আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যশাস্ত্রে জননী জন্মভূমিকে স্বর্গ অপেক্ষা গরিয়সী করিয়াছেন অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমির তুলনায় স্বর্গভোগও যেন তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; নরজীবনে যদি কাহাকেও জননী জন্মভূমির সেবা ও সঙ্গত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ ভোগ সুখের আবাস স্বর্গধাম যাইতে অনুরোধ করা যায় তবে তিনি মমতার বশবর্ত্তী না হইয়া যেন বিচার পরায়ণ হইয়া স্বভাবতঃই স্বর্গবাস অগ্রাহ্য করিবেন। পিতা ও আমার যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, স্বর্গ, পরমতপস্যা, পিতা প্রসন্ন হইলে সমস্ত দেবতারাই প্রসন্ন হয়েন। পুত্র সংসারী হইলেই পিতা-মাতার উপর আর কোন সংসারের কর্ত্তব্যভার নাই, সংসার হইতে তাঁহাদের অবসর লইবার সময়, পিতামাতার বানপ্রস্থাশ্রম; সুতরাং পুত্র পুত্রবধূর নিকটে সর্ব্বদা দেবদেবী তুল্য নিয়ত পূজার ও সেবার সামগ্রী। আজ আর সে ধর্ম্ম মন্দির আর্য্যসংসার নাই, যথাকালে যথানিয়মে পুত্রের সংসার প্রবেশ নাই; পিতামাতার অবসরকাল নিরূপিত নাই, বানপ্রস্থাশ্রম লোপ পাইয়াছে। আর্য্যসংসারে সাধারণতঃ এক্ষণে পিতামাতা দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত নয়, পুত্র পুত্রবধূও সাধক সাধিকারূপে দৃষ্ট হয় না; আজ আর্য্যসংসারে পিতামাতার দেবভাবের কথা দূরে থাকুক কর্ত্তব্য বোধ নাই, পুত্র পুত্রবধূর ও নিয়ত মিলন, কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, পতিপত্নীর ভালবাসা নাই, ভাই ভগিনীর ভালবাসা ও ভাই ভাই সদ্ভাব নাই, আত্মীয়ের আত্মীয়তা নাই, প্রতিবেশীর সহানুভূতি নাই, স্বজাতির প্রীতি নাই, স্বধর্ম্মের সেবা নাই, অতিথির আদর নাই, স্বদেশের অনুরাগ নাই। আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ এক্ষণে হতশ্রী, আর্য্যসংসার একেবারে বিশৃঙ্খল, তাই বড়ই আক্ষেপে, পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবার উদ্দেশ্যে, স্বরূপ পরিচয় বুঝাইবার জন্য, নূতন করিয়া যেন গড়িবার অভিপ্রায়ে আর্য্যসংসারে পিতামাতার

প্রতি পুত্র পুত্রবধূর কর্ত্তব্য বুঝাইতে হইতেছে। পিতামাতারই যখন দেবদেবীর ভাব নাই তখন আর পুত্র পুত্রবধূর সাধক-সাধিকার আচরণ কোথা হইতে প্রত্যক্ষ হইবে। পুত্র, পুত্রবধূর ন্যায় পিতামাতাও শাস্ত্রের দাস, ভগবানের আজ্ঞাবহ জীব, পিতামাতাকে অহরহঃ এই ভাব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তদনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে; পিতামাতা সর্ব্বদা নিজের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, নিয়ত পুত্র পুত্রবধূর নিকট দেবভাব দেবচরিত্র প্রদর্শন করিবেন, পিতামাতাও যেমন সাক্ষাৎ শিবশক্তি, পুত্র ও তদ্রূপ সেই শিব-সাক্ষাৎ পিতার আত্মমূর্ত্তি, শক্তিরূপা সেই মাতার প্রাণের পুত্তলি এবং পুত্রবধূও সেই পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী, আপন আপন কর্ত্তব্য সকলকেই প্রতিপালন করিতে হইবে, একদিকে পিতামাতা কর্ত্তব্যপালন করিলেন কিন্তু পুত্র পুত্রবধূ কর্ত্তব্যের অপালন করিল, অথবা পুত্র পুত্রবধূ কর্ত্তব্য পালন করিলেন পিতামাতা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন, সেক্ষেত্রে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল, ভগবান্ অপ্রসন্ন হইলেন সুতরাং সংসারে পাপের দৃশ্য প্রকাশিত হইল, জ্বালা যন্ত্রনা কলহ অশান্তিতে পরিবারবর্গ পীড়িত হইতে থাকিলেন।

কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে কিন্তু এক সাধারণ নিয়ম সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত নিজের কর্ত্তব্যপালন করিবার সময় অপরে তাহার কর্ত্তব্যপালন করিতেছে কিনা, ইহার বিচার আলোচনা মীমাংসা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের নিয়ম নয়। অপরে যে যাই করুক না কেন, আমি আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিব ইহাই কর্ত্তব্য পরায়ণের বিচার ও ব্যবস্থা। মানুষের মনুষ্যত্ব না জন্মিলে, অগ্রে মানুষ ধার্ম্মিক না হইলে, নিত্য সত্য, শৌচ দয়া দানের অভ্যাসকারী না হইলে কোন আশ্রমেরই কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হয়না, কোন আশ্রমই সুখকর হয়না। সুতরাং যতই কেন বর্ত্তমান সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা যাউক না কেন, যতই কেন পিতামাতার ত্রুটি, শ্বশুর শাশুড়ীর অসদ্ব্যবহার, পুত্র পুত্রবধূর অভক্তি, অসদাচরণ, ভাই ভাই অসুরের আচরণ, সহোদর সহোদরার কাতর ভাব, আত্মীয়কে শত্রুজ্ঞান, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা হিংসা পরশ্রীকাতরতা, সমাজের প্রতি অনাস্থা, অতিথির অনাদর, জন্মভূমির প্রতি ঔদাসীন্য প্রভৃতি প্রকাশ্যে নীচ দৃষ্টান্ত যতই কেন তন্ন তন্ন করিয়া দেখান যাউক না কেন, তাহাতে কাহারও কোন কালে চক্ষু ফুটিবে না, কেহ কর্ত্তব্য বুঝিবে না, কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইবে না। মনুষ্যত্বযুক্ত মনুষ্যকে মনুষ্যের কর্ত্তব্য বুঝাইতে হয় না, মনুষ্য চরিত্র দেবচরিত্রের অনুকরণকারী অথবা মনুষ্য দেখিয়াই দেবতার ভাব বুঝিতে পারা যায়, মনুষ্য-

চরিতে নিত্য প্রীতি ও অহিংসার প্রবাহ, নিত্য সহিষ্ণুতা, নিয়ত ত্যাগশীলতা পরিলক্ষিত হয়। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্তিষ্টকামধুক্॥ দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" (গীতা) যজ্ঞসহ প্রজা (মানব) সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি প্রথমেই আদেশ করিয়া ছিলেন তোমরা যজ্ঞের দ্বারা নিয়ত বর্দ্ধিত হইতে থাক, যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে, যেহেতু যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে ভাবনা করিবে সুতরাং দেবতারাও তোমাদিগকে ভাবনা করিবেন, পরস্পর পরস্পরের ভাবনা দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিবে। প্রকৃত মানুষ নিত্য বিধাতৃবিহিত সম্পর্কে দেবতাদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা রাখিবেন এবং তাহা হইলেই বাসনানুরূপ ফললাভ বা তৃপ্তিলাভ করিবেন। সাধারণতঃ মনুষ্যেরা, দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার কথা দূরে থাকুক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্যস্থাপনেই অক্ষম, সর্ব্বত্রই যেন মনুষ্যে মনুষ্যে পশুর আচরণ, কাজেই সংসারে সমাজে মানুষের মঙ্গল আনন্দ কি প্রকারে সংঘটিত হইবে! তজ্জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমের কথা লিখিতে গিয়া আর প্রত্যেক পরিবারের ভিতর প্রত্যেক সমাজের ভিতর মনুষ্যের বিস্তৃতভাবে দোষ দেখাইয়া কর্ত্তব্যের ত্রুটি বুঝাইয়া আবার সেই দোষ বা ত্রুটিমোচনের উপায় বা উপদেশ দিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। মহাদোষী মহাপাপীও সময় বিশেষে নিজের পাপ বুঝিতে পারে, তথাপি যে দোষের অনুসরণ, পাপের অনুষ্ঠান করে, তাহার কারণ ক্ষণিক ভাবনা বা উপদেশে, বারেক গ্রন্থপাঠে কাহারও চরিত্র সংশোধিত হয় না বহুদিন ধরিয়া আবার গুণের অনুসরণ, পুণ্যের অনুষ্ঠান না করিলে বদ্ধমূল সংস্কার ঘুচিবার নয়। ঘরের প্রাচীর অশক্ত হইলে ছাদ্ মেরামত করিয়া কতক্ষণ ঘর খাড়া রাখিতে পারা যায়। নিরাপদ দেখিতে হইলে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া আবার বনিয়াদ্ হইতে নূতন করিয়া দেওয়াল দিয়া ঘর করিতে হইবে; সকল আশ্রমের মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কাল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বালক বালিকার যথার্থরূপে বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষা না হইলে, যথার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও চরিত্রগঠন না হইলে কোন আশ্রমেরই উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবেনা এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে একবার চরিত্রগঠন হইলে আর কোন আশ্রমের স্বতন্ত্র উপদেশ পাইবার প্রয়োজন হয় না, কেন না ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যাবতীয় আশ্রমের কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়া থাকে, সংসারাশ্রমে কর্ত্তব্যতৎপর প্রত্যেক নরনারীকেও একমাত্র বুঝাইবার কথা, অহরহঃ স্মরণ

করাইবার কথা যেন সংসারে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, তাহাদের মমতায় জড়িত হইয়া আত্মবিস্মৃতি না ঘটে, ভগবানের সংসার ভুলিয়া গিয়া নিজের সংসার বলিয়া মিথ্যাবোধ বা ভ্রম না জন্মে, বানপ্রস্থাশ্রমের বা বৈরাগ্যের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে যেন আনন্দে ভগবানের নাম করিয়া, ভগবানের জয়কীর্ত্তণ করিয়া সংসার হইতে অবসর লইতে সক্ষম হয়।

বার্দ্ধক্য—বৈরাগ্য।

ধার্ম্মিকের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে যতই দেহবল কমিতে থাকে মনবল ততই উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। বার্দ্ধক্যে বা নিবৃত্তিকালে অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমে ধার্ম্মিকের মন, সংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে ভগবানের দিকে ছুটিতে থাকে এবং যতদিন ভগবানের দর্শন না পায়, ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে, যতদিন সর্ব্বভূতে ভগবান ও ভগবানে সর্ব্বভূত দেখিতে না পায়, দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়া আত্মাতে পরমাত্মার মিলন দেখিতে না পায়, ততদিন প্রাণের আকাঙ্খা, আশা পূর্ণ হয় না, ততদিন ভগবদুপাসনার অবসান হয় না, ততদিন বৈরাগ্যের পরিসমাপ্তিতে সন্ন্যাসের উদ্ভব হয় না। মানবের পূর্ণ পরমায়ু শতবর্ষের মধ্যে পচাত্তর বৎসর কাল ভগবান মানবের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, দিবারাত্রি পশ্চাতে২ দাঁড়াইয়া থাকেন, কেবল মাত্র ২৫ বৎসর কাল ভগবান মানুষের পশ্চাদ্ভাগ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকেন:—"মানব, তোমার সমস্ত জীবনের মধ্যে তিনভাগ জীবনের সম্পূর্ণ ভার আমি গ্রহণ করি, তোমার রক্ষার জন্য, তোমার কর্ম্মের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকি, তোমাকে নিজের মতন করিয়া নিজের কাছে আনিবার জন্য ছটফট্ করিতে থাকি, কিন্তু তোমায় নিজের দায়িত্বে জীবনের দ্বিতীয়ভাগ ২৫ বৎসর কাল কাটাইতে হইবে, এই পঁচিশ বৎসর কাল গার্হস্থ্যাশ্রমে আমার আদেশমত কর্ত্তব্যবোধে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলেই এবং যথাকালে কর্ম্ম শেষ করিয়া বৈরাগ্য-জীবনে প্রবেশ করিতে পারিলেই আর তোমার কোন ভাবনা নাই, তোমার ভাবনা আমিই ভাবিব, তোমার মঙ্গল সুখশান্তি আমিই আনিয়া দিব, তুমি তখন আমার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইবে,' দদামি বুদ্ধিযোগং

তং যেন সামুপযান্তিতে’ ‘তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং আমার এই উক্তি সকলের প্রত্যক্ষ ফল আস্বাদ করিতে থাকিবে”। ভগবানের দয়া ভগবানের কার্য্য স্মরণ করিলে অতি পাষণ্ডহৃদয়েরও চক্ষুতে জল আসে, বাল্যে ভগবান মানবের মাতাপিতারূপে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষার কালে বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যরূপে বিদ্যাশিক্ষা কর্ম্মশিক্ষা দিয়া মানবের কতইনা মঙ্গল বিধান করেন, মানবের বিচারচক্ষু খুলিয়া দেন, মানবত্ব বুঝাইয়া দেন, গার্হস্থ্যাশ্রমে স্বল্পকাল সেই মানবত্বের পরীক্ষা করেন, আবার বানপ্রস্থাশ্রমে সন্ন্যাস জীবনে মানবের দিবারাত্রির সখা হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকেন। আজকাল ভারতে বানপ্রস্থাশ্রম বা বৈরাগ্যের সেবা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, গৃহত্যাগ সংসারত্যাগ করিতে হইবে, শাস্ত্রকথা শুনিলেই প্রাণ চমকিয়া উঠে, সংসারত্যাগ একেবারেই অসাধ্যসাধন মনে হয়, সন্ন্যাসের কথা ত যেন কাহারও বুঝিবারই শক্তি নাই। আধুনিক যাঁহারা বড় ২ বিদ্বান্ উপাধিধারী বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাঁহাদের সংসার চিন্তায়, অর্থোপার্জ্জনে কৃতিত্ব যথেষ্ট, নামেরও অভাব নাই, কিন্তু আত্মচিন্তা আর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনে উদয় হয় না! সবদেশের খবর রাখেন, সবজাতির খবর রাখেন, বিজ্ঞানের ভাবনা ভাবেন কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভাবনাটা একেবারেই ফাঁক্। মুখে যিনি যতই পাণ্ডিত্য দেখান্ না কেন, সাধারণ মনুষ্যের মৃত্যুর ভাবনা ভাবিবার ক্ষমতা নাই; মৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে হইলে বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় অনেকদূর দৌড়াইতে হয়, দৃষ্টিশক্তি বহুদূর বিস্তৃত করিতে হয়, জীবমান ও জীবনান্ত কালের সংস্রব বুঝিতে হয়, জীবনমরণের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কাজেই যে সে মনুষ্যের যা তা বিদ্যার কর্ম্ম নয়, যে মনুষ্য জন্ম মৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে না শিখিয়াছে সে মনুষ্য নামেরই যোগ্য নয় বা কোন কালেই প্রকৃত মনুষ্য হয় না, ভগবানের সত্ত্বা ভগবানের কার্য্য বুঝিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং আশ্রমধর্ম্মের পালনে উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবে কি প্রকারে! ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অপেক্ষা সংসারাশ্রমে আনন্দ অধিক, আবার সংসারাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাশ্রমে অধিকতর আনন্দ, কেন না মানব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, সংসারাশ্রমে কর্ত্তব্যবোধে ভগবানের কার্য্য করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে ভগবানকে ডাকিবার অবসর পায়, ভগবান্কে লাভ করিয়া থাকে, এই যদি আশ্রমের পরিণাম হয় তবে বানপ্রস্থাশ্রম অপেক্ষা আনন্দদায়ক আশ্রম আর কি হইতে পারে, কেন মানব দিবারাত্রি বানপ্রস্থা-

শ্রমের সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না, কেন আনন্দে সংসারাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রমের সেবা না করিবে!

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাহার চরিত্রগঠন হয় নাই, যথার্থ বিচারবুদ্ধির উদ্রেক হয় নাই, গার্হস্থ্যাশ্রমে যথারীতি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন হয় নাই, তিনি কখন বানপ্রস্থাশ্রম বা বৈরাগ্যের কথা বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং বৈরাগ্যের সাধন আর কি প্রকারে সম্ভব! বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ পালন না হওয়া হেতু মানবের ক্রমোন্নতি বুঝিতে যেন সকলেই অক্ষম, ঈশ্বরোপাসনারও নিরূপিত সময় ঠিক করিতে পারে না, অথচ ঈশ্বরোপাসনা লইয়াও বড় ব্যস্ত, বড় চিন্তিত এবং মিশ্রধর্ম্মের সাধনের ন্যায় সংসারাশ্রমে ভগবদুপাসনায় কাল নিরূপিত করিয়া না সংসারাশ্রমের পালন হয়, না ভগবদুপাসনার সিদ্ধি হয়, সুতরাং আজীবন সংসারও ছাড়িতে পারে না এবং ভগবানেও মিলিতে পারে না, সৃষ্টিতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠজীব, মনুষ্য দেহান্তে দেবত্বে উন্নীত হয়, ভগবানে মিলিত হইয়া থাকে, কাজেই প্রকৃত মনুষ্য হইয়া মরিলে আবার নূতন করিয়া মনুষ্য বা তদপেক্ষা নিকৃষ্টজীব হইতে হইবে কেন? এই উন্নতির পথ ছাড়িয়া দিয়া, মৃত্যুতে আনন্দবোধ না করিয়া যদি মৃত্যুর ভয়ে ছটফট করিতে হয়, সংসারের মায়া মমতায় জড়িত হৃদয় হইয়া অশ্রুবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া যদি মরিতে হয় তবে মনুষ্য হইয়া না জন্মিয়া ইতর প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণই যেন বাঞ্ছনীয় মনে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান মৃত্যুকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" যদি জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় মৃত্যু হয় তবে জীবন্তকাল অপেক্ষা মৃত্যুতে অধিকতর আনন্দ না হইবে কেন! এবং মৃত্যুর সেবা জন্য আনন্দে বৈরাগ্য না করিবে কেন! তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিজের মৃত্যুসময়কে 'প্রাণপ্রয়াণোৎসব' সময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের যেন মৃত্যুতে বড় আনন্দ এমন কি উৎসব জ্ঞান হইয়াছিল, কেন না শঙ্করাচার্য্যের জলন্ত বিশ্বাস, নিশ্চিত জ্ঞান যেন দেহান্ত হইলেই তিনি নিশ্চয়ই শিবশক্তির সঙ্গে মিলিত হইবেন। এক্ষণে বৈরাগ্যের বাধকই সংসার, পঞ্চাশ বৎসর কাল সংসারের সেবা করিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের মমতায় আবদ্ধ হইয়া, ধনধান্যের অধিকারী হইয়া, সংসারের ভোগ সুখে সুখবোধ করিয়া হঠাৎ সে সকল ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর ও কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ পঞ্চাশ বৎসরের পর যখন শরীরের বল হ্রাস হইয়া

আসে, পরিশ্রম অসহ্য হইতে থাকে, মনের দুর্ব্বলতা বাড়িতে থাকে, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা হয়, যখন একদণ্ড ঘর ছাড়িয়া পরিবারবর্গ ছাড়িয়া কোথাও প্রাণ স্থির থাকে না, তখন কি সব ছাড়িয়া, অনির্দ্দিষ্টভাবে, ঘরের ঠিক নাই, আত্মীয়ের সংস্রব নাই, আহারের সংস্থান নাই এমন অবস্থায় কোথায় কোন্ দিকে কাহার ভরসায় ভগবান খুঁজিতে যাইব! কেমন করিয়া বৈরাগ্যের সাধন করিব! তজ্জন্যই বলা হইয়াছে হাজার শাস্ত্রপাঠ কর না কেন, হাজার উপদেশ শোন না কেন, চরিত্রের সাধন মনের সাধন না হইলে, ভগবান্‌কে ভালবাসিতে না শিখিলে, ভগবানে বিশ্বাস না জন্মিলে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানকে প্রিয়জন আত্মীয় বোধ না করিলে কেহ কি সংসার ছাড়িয়া ভগবানের সেবা করিতে পারে! হঠাৎ বৈরাগ্য হয় না, অনেক দিনের সাধন অভ্যাস বিশ্বাসের ফলে বৈরাগ্যোদয় হয়, একদিকে যেমন সংসারাবদ্ধ মনুষ্যের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর কিছুতেই মনে আর বৈরাগ্যের উদয় হয় না, অন্যদিকে তেমনি ধার্ম্মিক বিশ্বাসী পুরুষের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত সংসার-ভগবানের বিচার বুঝিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে ২৫ বৎসর কাল সংসারে ভগবানের কার্য্য না করিলে, ভগবানেও বিশ্বাস পুষ্ট হয় না, বৈরাগ্যের উপযোগী শরীর মনের গঠন হয় না। যাহারা বাল্যকাল হইতে সৎপথে চালিত হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও সংসার-ভগবানের যথার্থ বিচার বুঝিতে পারে নাই এবং সংসার-ধর্ম্মও যথারীতি পালন করিতে অক্ষম হইয়াছে, কাজেই যাহাদের বার্দ্ধক্যদশা বা নিবৃত্তিকালে আনন্দে ভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে নাই, তাহাদিগকে যদি বৈরাগ্যের কথা বুঝিতে হয় তবে একদিকে সংসার ও অপরদিকে ভগবান রাখিয়া বিচার করিতে হইবে (বলা বাহুল্য যাহারা মূঢ়তাবশতঃ ভগবানে পূর্ণ অবিশ্বাসী কিম্বা দাম্ভিকতাবশতঃ ঈশ্বর উড়াইতেও অগ্রসর সেই হতভাগ্য বা আত্মঘাতী নাস্তিকদের সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার নাই)। সংসারের মমতা, ভোগসুখ, জ্বালা যন্ত্রণা, রোগ শোক সংসারী কাহাকেও বুঝাইতে হয় না, সকলেই ভুক্তভোগী, কেবল মাত্র বুঝাইতে হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ু ক্ষয় পাইতেছে, দেহবল কমিয়া আসিতেছে, মমতা জড়তা বৃদ্ধি পাইতেছে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সবছাড়িয়া একদিন যাইতেই হইবে, কোথায় যাইতে হইবে ঠিক নাই। মৃত্যুর দিন ভাবিতে গেলে আর কোন দিন ভাল লাগেনা, মৃত্যুর পর সংসারের সম্পর্ক ভাবিলে আর কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা হয় না, মৃত্যুর পর ভোগ সুখের পরিণাম ভাবিলে আর ভোগ সুখের সেবা করিতে

ইচ্ছা হয় না, অধিক কি মৃত্যুর পর যখন এই কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহখানাও অকর্ম্মণ্য অসম্পর্কীয় হইয়া পড়িয়া থাকে; তখন দেহধারণ, দেহের সুখভোগ বিধান, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান সব যেন অনর্থক ভুষাবঘাত বলিয়া মনে হয়, কৈ শেষ পর্য্যন্ত ত কেহ কুলায় না! অগত্যাই মানুষের পরিণাম মানুষের সিদ্ধান্ত এই দেখিতে পাই মানুষের ভিতর কে যেন কোথা হইতে আসিয়া দিন কতক মানুষ নাচাইয়া কতখেলা খেলিয়া শেষে মানুষ ফেলিয়া চলিয়া যায়; তবে আর সংসার কার জন্য করিব? কয়দিনের জন্য? কারজন্য দিনরাত্ ঘুরিয়া মরি, সুখ সম্পদ ভোগ কে করিবে? কতকষ্টে ধনোপার্জ্জন, কত কষ্টে আত্মীয়ের ভরণ পোষণ, তার উপর সংসারের যন্ত্রণা রোগ শোক মনস্তাপ যেন একদিনের জন্যেও ছাড়ান্ নাই; তাই সংসারের ভাবনা ভাবিতে গেলে, সংসারের বিচার করিলে নিজের ভাবনা আসিয়া পড়ে, ভগবানের কথা মনে আসে অহংজ্ঞানের বিচার করিবার প্রবৃত্তি হয়, মানুষের ভিতর কে খেলা করে তখন একবার্ বুঝিবার সাধ্ হয়, দেহের ভিতর সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ মানুষ, সে চলিয়া গেলে মানুষের দেহ মড়া, এই মড়ার সাজে একদিন সকল্কেই সাজিতে হইবে, অতএব মড়া হইবার জন্য কাতরতা কেন! মড়া হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিনা কেন, যাহা হইবেই নিশ্চিত তাহাতে আনন্দ না হইয়া উদ্বেগ কেন! উদ্বেগের একমাত্র কারণ—দেহেতে আত্মবুদ্ধি সুতরাং ভগবানকে বিস্মরণ। যখন স্পষ্টই বুঝিতেছি দেহের ভিতর এক চৈতন্যের খেলা, জন্ম ও মৃত্যু তাঁহার আদি ও অন্তখেলা; এই আদি অন্ত খেলায় মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই, তবে আর মাঝের দিনকতকের উপর কর্তৃত্ব দেখাইয়া ফল কি? আমার দেহ, আমার রূপ, আমার বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আমার মানাপমান ইত্যাদিতে মিথ্যা 'আমার' কল্পনার কোন্ প্রয়োজন! যতই আমার আমার বাড়াইতে থাকি ততই ত সুখের বৃদ্ধি না দেখিয়া দুঃখের বৃদ্ধি দেখিতে পাই, সংসারে আসিয়া যদি কাহাকেও আমার বলিতে হয় তবে আমার দেহের ভিতর সেই চৈতন্য এবং সেই চৈতন্যেরি "আমি," সেই চৈতন্য হইতেই 'আমি'র উৎপত্তি এবং সেই চৈতন্যের অভাবেই আমিত্বের নাশ। যাঁহার আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহার আমি হইয়া থাকিব! এবং তাঁহাকেই বা আমার না বলিয়া কাহাকে আমার বলিব! সুতরাং সংসারান্তে মানবের পক্ষে বৈরাগ্যের সাধন করিতে হইলে প্রথমে মৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে হইবে, মৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে গেলেই সংসারের মমতা নষ্ট হইয়া

যাইবে, দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তখন দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান্ চৈতন্যরূপী ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা হইবে। ভগবানকে ডাকিতে হইলেই ভগবানে আত্ম নিবেদন করিতে হইবে, কাতরপ্রাণে বলিতে হইবে—' ভগবান্! তোমাকে ভুলিয়া, তোমার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া, তোমার নিরূপিত পথে না চলিয়া, তোমার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া তোমার প্রীতিউদ্দেশে সংসারের কর্ম্ম না করিয়া, দিবারাত্রি প্রবৃত্তির দাস হইয়া, স্বেচ্ছায় পাপের সংসার গঠন করিয়া বড় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি প্রভো! সংসারের মমতা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকায় বড়ই ভীত হইয়াছি, দয়াময়! দয়া করিয়া একবার সংসারের মমতা ঘুচাইয়া দাও, ইন্দ্রিয়ের দাস ঘুচাইয়া একবার নিজদাস করিয়া লও হরি! অনেক দিন সংসারে অনর্থক খাটিলাম, একবার নিজের জন্য কিছুদিন খাটিবার সময় দাও ঠাকুর! খাটিবার শক্তি দাও প্রভো! যেন শেষের দিন সব ভুলিয়া তোমাকে ভবিয়া আনন্দে মরিতে পারি।' তাই বলি ভাই সংসারি! বার্দ্ধক্য দশা স্মরণ না করিয়া, বৈরাগ্যের ভাবনা না ভাবিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাক ভাই! কেন ভাই বৈরাগ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারনা! কি কারণে আশ্রমের কথা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছ! নিজের কথা নিজের কার্য্য নিজের পরমায়ু ত বেশ বুঝিতে পার, অনেক দিন সংসারের সেবা করিলে, অনেক দিন স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভাবনা ভাবিলে, অনেক দিন ধনোপার্জ্জন করিলে, খাটিয়া খাটিয়া দেহটা অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া গেল, তবু কি একবার ভগবানের জন্য খাটিবার প্রবৃত্তি আসিল না! অন্ততঃ শেষ কিছুকাল নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবারও কি প্রবৃত্তি আসিল না! সংসার করিতে শাস্ত্রে অনেক লম্বা দিনের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর কি বড় কম সময়! পূর্ণ পরমায়ুবিশিষ্ট ধার্ম্মিকের পক্ষেই পঞ্চাশ বৎসর অর্দ্ধেক পরমায়ুকাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস পাপকর্ম্মরত হতজীবন তোমা আমার পক্ষে ৫০ বৎসর যে পূর্ণ পরমায়ু, কেহ বা ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেই চলিয়া যাইব। দিবারাত্রি চক্ষের সম্মুখে কত অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, তা দেখিয়াও কি একদিনের জন্যও চৈতন্য হয় না! মানুষের ভ্রান্তির সীমা নাই! শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই, পথের সম্বল কিছুই নাই, অথচ মৃত্যুর পরে স্ত্রীপুত্রপরিবারের কেমন করিয়া ভরণপোষণ হইবে, কেমন করিয়া তাদের মান সম্মান বজায় থাকিবে, কেমন করিয়া বিষয় সম্পত্তি রক্ষা পাইবে—মানুষ তাহার ভাবনা ভাবিয়াও, ব্যবস্থা করিয়াও মরিতে

চান ! যাহা হউক যখন পূর্ণ পরমায়ু বিশিষ্ট ধার্ম্মিকের জীবনে ৫০ বৎসরের পর বৈরাগ্যের বিধান, তখন কি অল্পায়ুবিশিষ্ট পাপী মানবের পক্ষেও ৫০ বৎসরের পর বৈরাগ্যের কথা বড়ই বিরক্তিজনক ! কিন্তু হাজার বৈরাগ্যের কথা বলা যাক্‌না কেন, হাজার সংসারের চিত্র অঙ্কিত করা হউক না কেন, মানুষ অগ্রে ধার্ম্মিক হইতে না পারিলে তাহার জীবনে মঙ্গলদায়ক কোন কর্ম্মই সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে একেবারে ভগবৎলাভ দূরের কথা মনে হইতে পারে কিন্তু ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ এবং ধার্ম্মিক হইতে পারিলে ভগবৎলাভও সহজ হইয়া দাঁড়ায়। সাধনের ক্রম বুঝিতে হইলে আগে ধর্ম্ম পরে ভগবান, ধর্ম্ম ছাড়িয়া, সত্য শৌচ দয়া দানের সেবক না হইয়া ভগবানের আরাধনা করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, অধার্ম্মিকের সেবায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হন্ না বরং সেবাপরাধী জ্ঞান করেন। উপস্থিত সময়ে ইহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, ভারতভূমে বর্ত্তমান আর্য্যসংসারে যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত তাহাদের অধিকাংশের চরিত্রেই এখন সেবাপরাধ যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—অনেকেই ত্রিসন্ধ্যা করেন, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা করেন, অনেকেই নানারূপ তিলকমালা ধারণ করেন, মন্ত্রজাপ, নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, এদিকে কিন্তু ধর্ম্মের দিক্ দিকে যান্ না, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত একভাবে কাটিয়া যায়, সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্যের সেবা করিতে আর অবসর হয় না, রোগের যন্ত্রণায় সংসারের মমতায় মৃত্যুর বিভীষিকায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে থাকে, যাহারা প্রথম হইতে চরিত্রবান্ হইতে পারে নাই, চতুষ্পাদ্ ধর্ম্মের সেবা করিতে ত্রুটি করিয়া যথারীতি আশ্রমধর্ম্মপালনে অক্ষম হইয়াছে, তাহাদের যদি বৈরাগ্য সাধনের প্রবৃত্তি হয়, যদি ভগবান্‌কে লাভ করিবার অন্তরে পিপাসা জাগে, তবে যে দিন যে মুহূর্ত্তে ঐরূপ প্রবৃত্তির বা পিপাসার উদ্রেক হইবে সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ধর্ম্মের নামে ভগবানের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে :—(১) আর কদাপি ধর্ম্মের সেবা করিতে ত্রুটি করিব না, (২) বর্ণোচিত আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যের আর কখনও অপালন করিব না, (৩) প্রত্যেক কার্য্যে একবার ভগবান্‌কে স্মরণ করিব, (৪) যাহাতে শেষের দিন সবভুলিয়া ভগবানকে ভাবিয়া মরিতে পারি তজ্জন্য প্রস্তুত হইব, (৫) আর কখনও ভগবান্‌কে ভুলিব না।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিতে হইলে নিয়মিত রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও শাস্ত্রচিন্তা করিতে হইবে, নিয়মিত রূপে ধার্ম্মিকের সঙ্গ করিতে হইবে, আত্মীয় সমাজে যদি কেহ ধর্ম্মের প্রতিকূলাচারী বা ভগবৎবিরোধী হয় তবে তাহার

সঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, জীবিকাবৃত্তি যদি ধর্ম্মের বাধক বা ভগবানের পথের কণ্টক হয় তবে সে জীবিকাবৃত্তি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য। ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ কিছুই নাই, ভগবান্ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃদ কেহ নাই, ধর্ম্মিকের সঙ্গ অপেক্ষা অন্যত্র প্রিয়সমাজ আর নাই। ঐরূপ ভাবে নিয়ম প্রতিপালন করিতে করিতেই ভগবানে ভক্তি আসিবে, ভগবানে ভক্তি আসিলেই অন্তরে জ্ঞানের আবির্ভাব হইবে, জ্ঞানের উদয়ে দেহের ও সংসারের মোহ অন্তর্হিত হইবে, তদনন্তর ভগবল্লাভ বা মুক্তি। বানপ্রস্থাশ্রমে বা বৈরাগ্যদশায় বানপ্রস্থাশ্রমী বা বিরাগীকে কিরূপ ভাবে আচরণ ও দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে বাস করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে ভগবদুপাসনা করিতে হইবে তাহার সাধারণ নিয়ম ও বিচার বুঝিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যায় বৈরাগ্য জীবনে ভগবদুপাসনার জন্য কেবল দেহরক্ষা ও প্রাণধারণ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের প্রয়োজন নাই, তজ্জন্য এইরূপ ভাবে আহার করিতে হইবে যেন দেহরক্ষা ও প্রাণধারণ ভিন্ন জিহ্বার তৃপ্তি লালসা না জন্মে; এইরূপ ভাবে বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে দেহরক্ষা লজ্জা নিবারণ ভিন্ন দেহের বিলাসিতার ভাব না আসে, এইরূপ স্থানে বাস করিতে হইবে যাহাতে বাসের সুখভোগ না জন্মে। সংসারের পর বৈরাগ্য সুতরাং সংসারীর ন্যায় বিরাগীর নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই, নির্দ্দিষ্ট দেশ নাই, অন্নধনের চেষ্টা ও সঞ্চয় নাই, আত্মীয় পরিবার নাই, নির্দ্দিষ্ট সমাজ নাই; পাছে সংসারের সংশ্রবে আবার অধঃপতন হয়, পাছে আবার সংসারে মোহমুগ্ধ হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিরাগীর পক্ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন :—('শুদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন এবং যাবদন্নে উদর পূর্ণ হয়; তদপেক্ষা অধিক অন্নগ্রহণ বা ভবিষ্যৎ সঞ্চয় করিবেন না, লোকালয়ে অধিকক্ষণ বা অধিকদিন বাস করিবেন না এমন কি তিন দিনের অধিক বাস একেবারেই নিষিদ্ধ, লজ্জা নিবারণ ও দেহরক্ষায় উপযুক্ত স্বল্পমূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, কাহারও সহিত গ্রাম্য কথাবার্ত্তা ও সামাজিক আলাপ পরিচয় করিবেন না, আত্মীয় পরিবারের খবর রাখিবেন না, শিষ্যসংগ্রহ করিবেন না, নিঃসঙ্গ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন')। তবে যাঁহারা সস্ত্রীক বৈরাগ্য করিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই মাত্র হইতে পারে যে তাঁহারা লোকালয়ের অদূরে নির্জ্জন স্থানে নির্দ্দিষ্ট গৃহে বাস করিতে পারেন কিন্তু লোকালয় আত্মীয় পরিবার গ্রাম্যসমাজ একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন, ভিক্ষা সংগ্রহ ভিন্ন অপর কোন কারণে

লোকালয়ে প্রবেশ বা বাস করিবেন না। ইহার পর ভগবদুপাসনার নির্দ্দিষ্ট-কাল বৈরাগ্য জীবনে কিরূপ ভাবে ভগবদুপাসনা করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা বা মীমাংসা বুঝিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সদ্‌গুরুর নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেহ কখন উপাসনা-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সক্ষম নয়, শাস্ত্রীয় উপদেশে চিত্তের উন্নতি সাধন হয়, সদসৎ বিচার বুদ্ধি জন্মে, কিন্তু সেই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে ভগবৎলাভ হয় তজ্জন্য সেই কার্য্যের অভ্যাস না করিয়া শুদ্ধ কার্য্যক্রম পাঠ বা স্মরণ করিলে কোন ফলই হয় না। উপাসনা কর্ম্ম, কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি বা কর্ম্ম সমাপ্তি, কর্ম্ম না করিলে হয় না। প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়া উপাসনাক্রমেই ইন্দ্রিয় মনের লয়সাধন করিতে হয়, তখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ আত্মার অনুভূতি আসে, তদনন্তর কিছুকাল আত্মক্রীড়ায় রত থাকিতে থাকিতে, আত্মা পরমাত্মার অবিচ্ছেদ মিলন বা সমাধি আসিয়া পড়ে, উপাসনার সমাধান বা ফলপ্রাপ্তি সমাধি অর্থাৎ ভগবৎলাভ। এই গ্রন্থে নানাবিধ দেবদেবীর নানারূপ উপাসনাক্রম লিখিয়া, শাক্ত শৈব সৌর বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি বহুবিধ উপাসক বা সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্ব সমালোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নয় এবং সেজন্যও আজ্‌কাল্ বৃহদায়তন বহুবিস্তৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণসংযুক্ত গ্রন্থেরও অভাব নাই। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য পড়িয়া অস্থির হওয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃত করা নয়, পরন্তু মস্তিষ্কে ধারণা করাই উদ্দেশ্য। শাস্ত্রপাঠ করিয়া যদি নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ, গন্তব্যপথ ঠিক না হয় তবে শাস্ত্র পড়িবার কোন আবশ্যকতাই নাই। গুরুমুখী বিদ্যা গুরুমুখে থাকাই ভাল, গ্রন্থমুখে পড়িলেই বিকৃত হইয়া যায়, সেই জন্যই এক্ষণে প্রায় আর উপাসনা কার্য্য দেখিতে পওয়া যায় না, ভক্ত জ্ঞানী সাধক সিদ্ধেরও দর্শণ দুর্লভ হইয়াছে; কিন্তু যেখানে সেখানে যার তার দ্বারা বড় বড় উপাসনা গ্রন্থ প্রচার হইতেছে, পড়িবার কিছুরই অভাব নাই—দ্বিজাতিদের গায়ত্রীতত্ত্ব, চতুর্ব্বর্ণের ও স্ত্রীজাতির আহ্নিককৃত্য, যাবতীয় দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, যাবতীয় ইষ্টমন্ত্র, ভক্তির নবধা লক্ষণ, তান্ত্রিকের দিব্য বীর পশুভাব, পঞ্চমকারের (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) সাধন, যোগীদের অষ্টাঙ্গযোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি), কুণ্ডলিনী চৈতন্য, ষটচক্র ভেদ করিয়া (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা) সহস্রারে অবস্থিতি, বৈষ্ণবদিগের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাব, ইত্যাদি

যাবতীয় সাধন সিদ্ধির কথা এক্ষণে গ্রন্থে সবই পাওয়া যায়। তবে আর ভাবনা কি? অভাব ত কেবল সাধন ও সিদ্ধির এবং সাধক ও সিদ্ধের, তাতে আর ক্ষতি কি! পুস্তকে ত সব আছে, পড়িতে পারিলে, বলিতে পারিলে, লিখিতে পারিলে আর ঠকায় কে? পরের কাছে ঠকিবার বড় ভয়, পরের চক্ষে ধূলা দিবার বড় ইচ্ছা, কিন্তু দিবারাত্রি যে নিজে নিজেকে ঠকাইতেছ তৎপ্রতি মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ নাই, নিজে অন্ধ ঘুচিবার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও আকাঙ্খা বা প্রয়াস জন্মিল না!! তজ্জন্যই বলিতেছি যদি উপাসনাতত্ত্ব শিখিতে ইচ্ছা হয় তবে কর্ম্মী সদ্‌গুরুর নিকট যাথারীতি উপাসনা শিক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মী সদ্‌গুরুর অভাব বুঝিলে অবিহিত উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বরং কাতরপ্রাণে ভগবান্‌কে ডাকা ভাল, ভগবান্‌কে সর্ব্বেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা আত্মগতি ও এক মাত্র সুহৃদ ভাবিয়া স্মরণ করা ভাল, এক্ষণে সাধারণতঃ উপাসনা লুপ্ত প্রায়, সাধক সিদ্ধেরও দর্শণাভাব, সচরাচর যাঁহারা কুলগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইষ্টমন্ত্রপ্রদান ও উপাসনা শিক্ষাদেন, তাঁদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ ও উপাসনা শিক্ষা করা অপেক্ষা গ্রন্থ পড়িয়া যেন অধিকতর শিক্ষা মনে হয়; কেননা কর্ম্মব্যাপারে পূর্ব্বোক্ত গুরু ও গ্রন্থ উভয়েই নীরব, নিশ্চল, অধিকন্তু গুরুদের আবার অনেকের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানও নাই, অনেক গ্রন্থে ভাষাটা শুদ্ধ থাকে। উপাসনাতত্ত্ব লিখিয়া বুঝাইবার নয় বলিয়াই এই গ্রন্থে লিখিতে প্রয়াস করা গেলনা, তবে উপাসনা সম্বন্ধে স্বল্প কিঞ্চিৎ আভাষ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে উপাসনা অর্থে শাস্ত্রে 'শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সগুণব্রহ্মে মনোভিনিবেশ' বলিয়াছেন। সেই শাস্ত্রোক্ত বিধি সাধারণ ধর্ম্মের অবিরোধী থাকিবে এবং উপাসনার অধিকারী হইতে হইলে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইবে। সাধন চতুষ্টয় যথা :—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য তদ্ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা এইরূপ জ্ঞান), (২) ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগ (অর্থাৎ কি ইহলোক কি পরলোকে কোন লোকেই কামনা না থাকা), (৩) ষট সম্পত্তি সম্পন্ন—শম, দম, উপরতি তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা (শম—অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ; দম—বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ; উপরতি—শব্দাদি বিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি; তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা; সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তাভিনিবেশ; শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস), (৪) মুমুক্ষত্ব—মোক্ষের জন্য ইচ্ছা। পূর্ব্বোক্ত উপাসনার অধিকারীকে যিনি মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিদ্ বা মুক্ত তিনিই সদ্‌গুরু ("স এব সদ্‌গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসৎ

ব্রহ্মবিত্তম")। পরন্তু, সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণব্রহ্মের বিচার আলোচনা পণ্ডশ্রম, সারকথা, ব্রহ্ম বা ভগবান্‌কে পাওয়া চাই, পাবার উপায় উপাসনা, যিনি ভগবান্‌কে পাইয়াছেন তিনই উপাসনাতত্ত্ব শিখাইবার সদ্‌গুরু এবং তিনিই উপাসকের প্রাণ ও প্রয়োজন বুঝিয়া ভগবানের নামরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বা দেখাইয়া দিবেন। বেশী বলিবার বা লিখিবার আবশ্যকতা নাই, প্রয়োজনের অধিক লাভ হইলেই অস্থিরতা জন্মে; বানপ্রস্থাশ্রমের বা বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য যে ভগবদ্‌লাভ সেই ভগবদ্‌লাভের যথার্থ পিপাসু, প্রকৃত অধিকারী হইয়া যিনি সংসার ত্যাগ করিতে সক্ষম তিনিই সার্থক আশ্রমের সেবা করিয়াছেন, যথার্থ মনুষ্য পদবাচ্য হইয়াছেন, সুতরাং সৃষ্টজগতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের পরে পরকালে ভগবৎলোকে তাঁরই অবশ্যম্ভাবী গতি।

জরা বা জীবন্মুক্তি।

(সন্ন্যাস।)

মনুষ্য জীবনের শেষভাগ ৭৫ বৎসর হইতে তদূর্দ্ধ ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীর্ণদশা বা মৃত্যুকাল, এই কালে মনুষ্যের কোন কর্ত্তব্য নাই, কেননা যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য, সমস্তই বৈরাগ্যজীবনে শেষ হইয়াছে। মানব (ধার্ম্মিক সাধকের সিদ্ধজীবন) কেবল এই কালে পরমানন্দে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, অথবা ইহপরকালের ভাবনামুক্ত হইয়া শুদ্ধ আনন্দময়রূপে ভগবদিচ্ছায় যেথানে সেখানে অবস্থিতি বা বিচরণ করিয়া বেড়ান। দেহত্যাগ মুক্তপুরুষের ইচ্ছাধীন, সাধারণ মনুষ্যের জন্মমৃত্যু ভগবানের ইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে, মুক্তপুরুষ ভগবৎশক্তি লাভ করে বলিয়া দেহত্যাগ জানিতে পারেন, অথবা ইচ্ছা করিয়া করিতে পারেন। শাস্ত্রে মুক্তির বা সমাধির যে প্রকারভেদ বর্ণনা আছে, তাহার আলোচনা এখানে নিরর্থকবোধে বাদ্ দেওয়া গেল, কেননা সমাধির বা মুক্তির অনুভূতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, এবং ভগবানও বাক্যমনবুদ্ধির অগোচর; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বলা যায়, শোনা যায়, বুঝা যায় তাহা মুক্তির বা সমাধির যথার্থ আস্বাদ নয়। শাস্ত্রকারেরা মুক্তি, সমাধির যে নানাবিধ লক্ষণ, অবস্থা বর্ণনা

করিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে, বুঝিতে হইবে, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক তাহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কেননা মুক্তি বা ভগবান সম্বন্ধে যতই বর্ণনা বা পরিচয় দেওয়া যাকনা কেন তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির নিকট স্বরূপবর্ণনা বা স্বরূপপরিচয় হইতে পারে না, শাস্ত্রবাক্য প্ররোচনা মাত্র, অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও যে আলোচনা বিচার করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য, মনুষ্যবুদ্ধিকে শুদ্ধ ভগবদভিমুখী করিবার জন্য; সেই ভগবদভিমুখী প্রবৃত্তি নিশ্চলা হইলেই ভক্তি বলা যায়, ভক্তি হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে সহজেই জ্ঞেয় ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, এই জন্যই উত্তরগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :— "গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান-তৎপরঃ। পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥ উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ। জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ"॥ (মেধাবী গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর হইলে ধান্যার্থীর ধান্যসঞ্চয় করিয়া পলালত্যাগের ন্যায় জ্ঞানলাভ হইলে শাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন এবং উল্কাহস্ত ব্যক্তি কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে করিতে দ্রব্য পাইলে যেমন সেই উল্কা বা প্রদীপের আবশ্যকতা বোধ করেননা, তদ্রূপ জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞেয় ভগবান্‌কে লাভ করিলে আর জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না অথবা জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়)। পরন্তু আরও বলিয়াছেন :— "ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি। অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি॥" বিজ্ঞেয়োঽক্ষর তন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং। বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাং॥" (একটি জ্ঞান, একটি জ্ঞেয় এইরূপ যদি সমস্ত বিষয় শাস্ত্র পড়িয়া জানিতে ইচ্ছাকর, তবে সহস্রবর্ষজীবী হইলেও শাস্ত্রের শেষ করিতে পারিবে না, অতএব পরমাত্মা অক্ষর ও তন্মাত্র, আর জীবন চঞ্চল বুঝিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া যাহা সত্য সেই সত্য স্বরূপের উপাসনাকর)। সুতরাং মনুষ্যজীবনের শেষভাগ মুক্তিকালের কথা আর কি বলিব! যিনি মুক্ত তিনিই বুঝিতে পারেন, এবং যিনি মুক্ত করিয়া দেন তিনিই বলিতে পারেন। ধার্ম্মিক, সাধক, সিদ্ধের পক্ষেই জীবনের শেষভাগ উত্তরোত্তর অধিক আনন্দদায়ক এবং সেই জন্যই ইতিপূর্ব্বে বৈরাগ্য প্রকরণে বলা হইয়াছে যে ভগবান্ মনুষ্যকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ পর্যন্ত উত্তরোত্তর আনন্দের আধিক্যই দিয়া থাকেন। মনই সুখ দুঃখের ভোক্তা, শেষ জীবনে যেমন দেহের বল কমিয়া আসে, তেমনই মনের বল বৃদ্ধি পায়, যেমন আহার

বিহার দ্বারা দেহবল বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ ধর্ম্মাচরণ ও সাধন দ্বারা মনবল বৃদ্ধি পায়, বৈরাগ্যের বা মুক্তিকালের অবস্থা যিনি ধর্ম্মাচরণ ও সাধন করিয়াছেন, তিনিই আস্বাদ করিতে পারেন; কিন্তু ধর্ম্মবর্জ্জিত সাধনহীন সংসারাসক্ত ঘোর ইন্দ্রিয়দাসের বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাদের পক্ষেই বৈরাগ্য অসাধ্যসাধন এবং তাহাদের শেষ জীবনই জীর্ণদশা বা মৃত্যুকাল। তাহাদের পক্ষেই "প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা, দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং। তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং, চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥" তাহাদের পরমায়ু যদি পাপাচরণ দ্বারা অকালে নিঃশেষ না হইয়া চতুর্থ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে তখন আর কি করিবে! তখনত তাহারা 'কিং করিষ্যতি'র দল, তখনত সংসারের মোহপাশে অধিকতর আবদ্ধ, তখন ও কিন্তু "অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥" হরি হরি, তখন আর তাহাদের কি গতি হইবে!! কি ব্যবস্থা করা যাইবে! তখন তাহাদের গতির মধ্যে মৃত্যুকালে অপরের মুখে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম কীর্ত্তন, আর মৃত্যুর পর হরি হরি বলিয়া শ্মশানে শবদেহ বহন। নিজের জীবনে নিজের গতি নিজে কিছু করিলেন না, শেষে পুত্রের দ্বারা গতির ভরসা, পুত্র অনেক করেন, পুত্র মরণকালে নাম শোনান, ৺ গঙ্গায় দগ্ধ পিতৃদেহের হাড় দেন, প্রেত বলিয়া পিণ্ড দেন, শ্রাদ্ধ করেন এমন কি যতদিন বাঁচেন, বৎসর বৎসর পিতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদিও করেন, তবে আর পিতার গতির ভাবনা কি? তবে আর পরকালের জন্য পিতার সাধন কেন? পরকালত পুত্রের হাতে, পুত্রই পরকালের পথ দেখাইয়া দিবেন; জীবমানে নাই বা পারিলেন, মৃত্যুর পর যখন অগ্নিক্রিয়া, অস্থিনিক্ষেপ, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি রহিয়াছে তখন পুত্র, না হয় পৌত্র, না হয় প্রপৌত্র, না হয় দৌহিত্র যে হউক মৃতকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিবেনই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনং" অথবা "পুন্নরকাৎ ত্রায়তে যঃ স পুত্রঃ" পুৎনরক হইতে যে ত্রাণকরে সেই পুত্র; পুত্রের দৌড় বুঝি নরক্ থেকে ত্রাণকরা! আর আসা যাওয়া হইতে ত্রাণ করিবে কে? শাস্ত্রে কিছু না থাকা নাই, যখন মানুষের যেরূপ অবস্থা তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ শাস্ত্র। যতই আশ্রমধর্ম্মের যথার্থপালন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল, অমনি শ্রাদ্ধাদিরও ধূম বাড়িতে লাগিল, মোট কথা, কোন অবস্থাতেই কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই, যদি বেঁচে থেকে নিজের মঙ্গল করিতে না পার, পরলোকের পথ দেখিতে না পাও, ক্ষতি নাই, একটি পুত্র রাখিয়া মরিতে

পারিলেই আর চিন্তা নাই। অধিকন্তু মানুষ যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, অধার্ম্মিক হইতে থাকিল, আশ্রম ধর্ম্মপালনে অক্ষম হইল, বৈরাগ্যের আর ক্ষমতা নাই, সংসারমোহে ঘোরতর আচ্ছন্ন, অমনি ব্যবস্থাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইল 'কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ', সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংসারে থাকিতে অধিকার জন্মিল। কলিতে ত সন্ন্যাস নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর ও ত অভাব নাই, সন্ন্যাস গ্রহণও ত উঠিয়া যায় নাই। এমনি দেশের অবস্থা হইয়াছে, শাস্ত্রের দশা হইয়াছে যে, সব যেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন, অথবা সামঞ্জস্য করিতে, কি যথার্থ সত্য বাহির করিতে কেহ অগ্রসর নয়, এখন আর সাধারণতঃ শাস্ত্রের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা নাই, নিজ২ স্বার্থসিদ্ধি হইলেই হইল, তাতে ধর্ম্ম থাকুন্ বা যান্। ৺গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে তাঁহারা মুক্ত হন, ৺কাশীধামে মানুষের মৃত্যু হইলে মানুষ মুক্ত হয়, কিন্তু এদিকে আবার গয়ায় পিণ্ডদানে ও কাশীমৃত্যুতেও শ্রাদ্ধাদি বন্ধ করিবার যো নাই! যাহা হউক এইরূপ বিরুদ্ধবাদের অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু বিচারপরায়ণ স্মরণ রাখিবেন:—"অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥" আশ্রমধর্ম্মানুসারে বৈরাগ্যের পর সন্ন্যাস, বৈরাগ্যের শেষ ফল ভগবদ্প্রাপ্তি, সুতরাং সন্ন্যাসীর তখন আর বিধিনিষেধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ কিছুরই অপেক্ষা বা অনুভূতি নাই, সন্ন্যাসী অহরহঃ আপনভাবে বা ভগবদ্ভাবে বিভোর, কোথায় থাকেন, কি করেন, কি খান্ কিছুরই প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তজ্জন্য শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর দেহধারণজন্য কোন রূপ চেষ্টাচরিত্রের ব্যবস্থা দেখা যায় না; সন্ন্যাসীকে কেহ আহার করাইয়া দিলে খান্, না দিলে খান্ না, বস্ত্রাদি পরাইয়া দিলে পরেন, নচেৎ পরেন না। সন্ন্যাস একটি অবস্থা বিশেষ, সন্ন্যাস কোন বিধিবদ্ধ কর্ম্ম নয়; কর্ম্মের পরাবস্থার নাম সন্ন্যাস। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥" এই ভগবদুক্তিতে সন্ন্যাসীর আচরণের আভাষ বুঝিতে পারা যায়, সন্ন্যাসী দেহের ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আশ্রমের ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া এক ভগবান্ সার করিয়া, আপনা ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে ভগবান্ দেখিতে থাকেন, তৎকালে তাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম জন্য তিনি কিছুরই দায়ী বা প্রত্যবায়ী নন্, দায়ী তখন সেই একমাত্র বিদ্যমান্ শ্রীভগবান্। উপস্থিত সময়ে যে সন্ন্যাসীর দল দেখিতে পাওয়া যায় এবং

সন্ন্যাসীর ভিতর হংস, পরমহংস প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ শুনিতে ও পুস্তকে দেখিতেও পাওয়া যায়, তাহা যদিও শাস্ত্রীয় প্রমাণের অনুমোদিত, কিন্তু এই প্রকরণে তাদৃশ সন্ন্যাসীর বিষয় লিখিবার উদ্দেশ্য নয়; তদ্রূপ সন্ন্যাসী-দিগকে বর্ত্তমান গ্রন্থের বৈরাগ্য প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে কোন কর্ত্তব্যের বিধান নাই, কেবল সংসারাবদ্ধ ও সংসারমুক্ত উভয় অবস্থার আংশিক আভাষ দেওয়া মাত্র উদ্দেশ্য; তথাপি যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—'যাদের ৭৫ বৎসর বয়সের পরও শরীর মনের অবস্থা কিছু ভাল থাকে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার করিতে ক্ষমতা হয় এবং সাধ্যমত কর্ম্মচেষ্টাও থাকে ও ইতিপূর্ব্বে কোনরূপ সৎপথের আলোচনা না করিলেও যদি শেষ জীবনেই সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তবে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি?'—ব্যবস্থা বলিতে হইলে ইতিপূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে—"স্বেচ্ছাচার ব্যবস্থা"; কেন না কোন্ আশ্রমের ব্যবস্থা সেই সময় বিহিত হইবে! আর সে সময় ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া চলিবেই বা কে! আকাঙ্খাও যেমন কার্য্যকর, ব্যবস্থাও তদনুরূপ ফলদায়ক। যাহা হউক ব্যবস্থা অনেক স্থানে ভূরি ২ আছে এবং সব অবস্থাতেই উপদেষ্টারও অভাব নাই। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সকলের প্রবৃত্তির অনুরূপ কথা বলা নয়, শাস্ত্রের সব প্রমাণ প্রতিপালন করা নয়; উদ্দেশ্য—মানুষের চরিত্রগঠন, জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য নির্ণয় ও ক্রমোন্নতির পথপরিচয়। যা বলা হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে, এবং তাও দায়ে পড়িয়া যেন বলিতে হইয়াছে, উপকার এক কথায় হয়, ভূরি ২ শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মানুষের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতে গেলে কোন ব্যবস্থাই হয় না; ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত না হইলে ব্যবস্থাই নয়, সুতরাং বকিয়া বা লিখিয়া মরা কেন! তবে এক কথা গ্রন্থে পাঠকের উপকার হউক বা না হউক, বিক্রী হইলে গ্রন্থকারের উপকার আছে, সেই জন্যই এখন ধর্ম্ম পুস্তকও ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে না হইয়া অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই যেন অধিকাংশ প্রচারিত হইতেছে। মানবের কর্ত্তব্যনির্ণায়ক এক খানি ধর্ম্মপুস্তক দুই চারি কথায় শেষ করা যাইতে পারে:—(১) সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ একমাত্র সত্য, (২) মানুষ তাঁর সৃষ্ট আজ্ঞাবহ জীব, (৩) মানুষ ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, স্বীয় কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, অহরহঃ সেই ভগবদাদেশে কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিবে, (৪) মানুষ নিয়ত সত্য, শৌচ, দয়া, দান, চতুষ্পাদসমন্বিত ধর্ম্মের সেবক হইবে, (৫) মানুষ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য

তবে এত ঘন ঘন প্রশ্বাসরূপে বাহিরে আসে কেন! ভিতরে বাহিরে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত। ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকিতে প্রাণের বড় ইচ্ছা, ভিতরে বাহিরে থাকিতে যেন সমান প্রীতি। ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকিতে না পাইলেই বড় কষ্ট, তুল্যরূপে শ্বাস প্রশ্বাস না হইলে বড় যন্ত্রণা, অধিকক্ষণ এক ভাবে দেহের ভিতরে বা বাহিরে থাকিতে হইলেই প্রাণ যেন দেহ ছাড়িতে ইচ্ছুক হয়। ভগবানের সঙ্গে এক প্রাণেরই মিলন দেখিতে পাই; প্রাণ ভিতরে থাকিলে স্থূল দেহের ভিতর পরিমিত সীমাবদ্ধ, আবার বাহিরে আসিলেই প্রাণময় অনন্ত আকাশের সঙ্গে মিশিয়া অনন্ত অসীম হয়। প্রাণই দেহের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাই মনে হয় ভগবানের খবর লইতে হইলে, দেহের ভিতর "আমি কে" বা আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে একবার প্রাণের সঙ্গ করিয়া দেখিতে হয়। প্রাণের সঙ্গ করিবার যে উপায় বা পথ, তাহাই সাধন ও সেই সাধনের নামই প্রাণকর্ম্ম, দয়াময় ভগবান, অনন্ত নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও মানুষের প্রতি অসীম দয়া দেখাইয়া প্রাণের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রাণের ভিতরে ভগবান্‌কে কেন খুঁজিব, তাহার সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মনুষ্যকে বিচারবুদ্ধি দিয়াছেন। অন্যরূপ উপাসনা বা সাধন দ্বারা ভগবান্‌কে পাইবার সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ ও কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে তাহাতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না জন্মিলে বিচার দ্বারা কাহারও বুঝিবার উপায় নাই এবং তাদৃশ উপাসনার উদ্দেশ্য ভগবল্লাভ, আত্মানুসন্ধান নয়, তবে ভগবান্‌কে পাইলে আর নিজের খবর পাইতে বাকি থাকে না, সমস্ত আশা, আকাঙ্খা পূর্ণ হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ভগবল্লাভ করিতে হইলে প্রথমে আত্মানুসন্ধান পরে ভগবল্লাভ, মানুষ পরিমিত জীব, ভগবান্ সেই মানুষের ভিতর পরিমিতরূপে প্রকাশমান হইয়াও অনন্তে মিশিয়া থাকেন, মানুষ প্রাণকর্ম্ম বা আত্মকর্ম্ম দ্বারা দেহের ভিতর আত্মরূপী ভগবানের দর্শন পাইলেই, সহজেই অনন্ত ঈশ্বরের অনন্তত্বে মিশিয়া যায়। প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের বা আত্মার উপাসনা স্বাভাবিক সাধন, অন্য সমস্ত সাধন, উপাসনা, বিকৃতস্বভাব মনুষ্যের জন্য, এবং তজ্জন্যই স্বভাব-চ্যুত বিকৃতবুদ্ধি মনুষ্যদিগের উপযোগী নানাবিধ সাধন উপাসনা নানারূপে শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, প্রাণকর্ম্ম ছাড়া অন্য যে

সকল উপাসনা বা সাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল উপাসনাক্রমে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না? তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে হয়, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, কোন মতের নিন্দা বা খণ্ডন করিয়া কোন মত স্থাপন করা নয়। গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—মনুষ্য কি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, মনুষ্যের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কি, কি জন্য মানুষ স্বাভাবিক ধর্ম্ম কর্ম্মের অধীন থাকিতে পারে না, অধঃপতিত মনুষ্য কিরূপে পুনরায় স্বপদে অধিষ্ঠিত হয়, কেমন করিয়া মানুষ ভগবানে মিলিত হয় ও সেই মিলনের উপায় বা সাধন কি প্রকার। সুতরাং এই গ্রন্থে শুদ্ধ স্বভাবের সেবক বা প্রকৃত মনুষ্যের ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় যে একমাত্র প্রাণকর্ম্ম তাহাই বলা হইতেছে; কিন্তু তা বলিয়া যেন এরূপ সিদ্ধান্ত না হয় যে বিকৃতস্বভাব মনুষ্যের পক্ষে যখন প্রাণকর্ম্মের ব্যবস্থা নয় তখন আজকাল্‌কার সাধারণ অধঃপতনের দিনে প্রাণকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য উপাসনারই অনুগামী হওয়া উচিত, এরূপ কুতর্ক ও অযুক্তির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কেননা, মানুষ যথার্থ মানুষ না হইলে ভগবল্লাভ বা আত্মসাক্ষাৎকারের অধিকারী হয় না। অধঃপতিত মনুষ্যের যদি কিছু প্রথম উপাসনা থাকে তবে অগ্রে মনুষ্যত্ব লাভ করা, মনুষ্যত্ব লাভ হইলেই দেবত্বের বা ভগবানে মিলিত হইবার স্বতঃসিদ্ধ আকাঙ্খা জন্মে এবং সেই আকাঙ্খার উদ্ভব হইলেই প্রাণকর্ম্মের সাধনের প্রকৃত সময় আরম্ভ হয়। গ্রন্থারম্ভেই দেখান হইয়াছে যে, মানুষ স্খলিতপদ হওয়াতেই, ও এক ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াই অসংখ্য দেব দেবীর বা কল্পিত দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সকল মনুষ্যের বিচারবোধগম্য আত্মানুসন্ধান ও একেশ্বরদর্শণের একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা প্রাণকর্ম্মও লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, শাস্ত্রে কিছুরই অভাব নাই, মানুষের যখন যে রকম অবস্থা, যেরূপ রুচি, তদনুরূপ ব্যবস্থা, উপাসনা ও দেবদেবীও নিরূপিত হইয়াছে; ফলে দাঁড়াইয়াছে,—কোন কিছুরই ঠিক নাই, স্থির মীমাংসা নাই, কাজেই সম্প্রদায়ভেদ, উপাসনাভেদ লইয়া উৎকর্ষাপকর্ষের ভয়ানক বাদানুবাদ। মানুষ হাজার অধার্ম্মিক হউক, হাজার কুকর্ম্মী থাকুক, ভগবানকে কিন্তু পাবার অধিকারী, ভগবানের উপাসনার অধিকারী, অতএব অসদুপদেশ বর্জ্জন করিয়া যদি এক সাধারণ উপদেশ দেওয়া হইত যে, মানুষ সর্ব্বাগ্রে ধার্ম্মিক হইবে, তারপর উপাসনার অধিকারী; তাহা হইলে আর দিন দিন উপাসনার দোহাই দিয়া মানুষের কুকর্ম্ম ও পাপবৃদ্ধি হইত না, মানুষকে দিন দিন সেবা-

পরাধী হইতে হইত না।. "একবার হরি নামে যত পাপ হরে। পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে॥" ইত্যাদি বচনে একদিকে যেমন নামমাহাত্ম্যের চরমসীমা বর্ণনা করা হইয়াছে অন্যদিকে তেমনই নির্ব্বোধের পক্ষে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; কেন না পাপী, যেন জীবনে যতই পাপ করুক না কেন একবার ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিলেই সব পাপ মুক্ত হইয়া যাইবে। ভগবানের নাম কিন্তু যেমন তেমন করিয়া করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবানের দয়া হয় না, অনন্যমন বা একপ্রাণ হইয়া ভগবানের নাম করিতে পারিলে তবে ভগবানের দয়া হয়, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। অনন্যমন, একপ্রাণ হইতে হইলে, মন প্রাণের সাধন জানা চাই, ইচ্ছা করিলেই বা আবশ্যক হইলেই অনন্যমন, একপ্রাণ হওয়া যায় না, শত শত পাপ করিয়াও ভগবানকে ডাকিতে পারিলে পাপ মুক্ত হইব, মনে করিয়া, পাপ করিবে কেন,—বিবেচনা করা মূর্খের বিচার, পরন্তু, পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যদি কিছু সদর্থ বা উদ্দেশ্য থাকে, তবে এই যে, যতবড় পাপী হউক না কেন, কিন্তু, ভগবান্‌কে ডাকিবার অধিকার আছে, তবে যে মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম করিবার প্রবৃত্তি হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের নামে শপথ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে এবং পরবর্ত্তী কালে একমাত্র পুণ্যকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান, আচরণ চলিতে থাকিবে। পাপী পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া, কখন ভগবানের নাম করিবার অধিকারী হয় না, পুণ্যকর্ম্মকারী ধার্ম্মিকেরই ভগবানকে ডাকিবার অধিকার। ভগবান দয়াময় বুঝিতে, ভগবান পাপীকেও দয়া করেন, পরিত্রাণ করেন বুঝিতে হয় না, পাপী পাপকর্ম্ম ছাড়িয়া, পুণ্যকর্ম্ম করিতে থাকিলেই ভগবানের দয়া হয়, পূর্ব্বে পাপী ছিল বলিয়া ঘৃণা করেন না, সুতরাং পাপীরও পরিত্রাণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক কুতার্কিক আছে, যাহারা মিষ্ট কথায় তর্ক করিতে শিখিয়াছে,—যে ভগবান যদি পুণ্যাত্মাকেই পরিত্রাণ করেন তবে তাঁর দয়া কেমন করিয়া বুঝিব, পুণ্যাত্মা ত নিজের পুণ্যের জোরেই উদ্ধার পায়, পাপীর উদ্ধার না হইলে ভগবানকে দয়াময় বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ কুতর্ক করিবার আগে যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে পাপী কি অবস্থায় মুক্ত হইবে, তবে নিশ্চয়ই ভাবিতে হয় যে পাপী পাপকর্ম্মবিরত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলেই মুক্ত হয়। ভগবানের দয়াময় নামের পরিচয়, দেহান্তকালের পরবর্ত্তী কালের বিচারব্যবস্থা অনুমান বা সিদ্ধান্ত করিয়া বুঝিতে হয় না, পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যায়। ভগবান, পাপী পুণ্যাত্মা, চোর:সাধু সকলকেই সমভাবে বিচরণ ও বাস করিবার জন্য পৃথিবীতে স্থানদান, সকলকেই সমভাবে জল বায়ু শস্যাদি, আলো অন্ধকার বিতরণ করিয়া থাকেন—ইহা অপেক্ষা দয়ার পরিচয় আর কি হইতে পারে! পূর্ব্বে২ বলা হইয়াছে ভগবৎরাজ্যে প্রাণীজগতে সমস্তই সাধারণ নিয়মাধীন, ভগবানের সেই নিয়ম অখণ্ড ভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং মনুষ্য সাধারণ নিয়মাধীন হইলেও শ্রেষ্ঠ জীব ও জ্ঞান-সমন্বিত বলিয়া ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, কর্ম্মকরণে স্বাধীনভাবে সক্ষম এবং তজ্জন্য কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগও করিয়া থাকে। শরীরযাত্রানির্ব্বাহ ও দেহধারণ-বিষয়ে যেমন সমগ্র মানবকে এক সাধারণ নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তদ্রুপ আত্মানুসন্ধান বা ভগবৎপ্রাপ্তি জন্য, সমগ্র মানবের পক্ষে এক সাধারণ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সেই সাধারণ নিয়মই প্রাণের সঙ্গ, প্রাণের সাধন বা প্রাণকর্ম্ম; প্রাণ কর্ম্মের নামান্তর আত্মক্রীয়া, আত্মক্রীয়ায় রত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ হইলেই আত্মার দর্শণ লাভ হয়। জন্ম, বাল্য, যৌবন, জরা, মৃত্যু ও দেহ-ধারণ বিষয়ে যেমন সকল মনুষ্যকেই এক নিয়মাধীন হইতে হয় তেমনই আত্মানু-সন্ধান বা ভগবৎ প্রাপ্তি জন্য এক সাধারণ পথের নির্দ্দেশ হইলে সকলেই সেই পথ অনুসরণ করিতে পারে এবং ভগবানেরও একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়; তাহা না হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির অসংখ্য পথ, অসংখ্য উপাসনা নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির যথার্থ উপায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ২ স্থানের জল স্রোতের মহাসমুদ্রে শেষ মিলনের ন্যায়, সকল উপাসনার শেষ ফল ভগবৎপ্রাপ্তি, এই রূপ যুক্তি তর্ক প্রমাণ সিদ্ধান্ত না করিয়া যদি মীমাংসা হইত—যে মানুষ যে দেশে যে বর্ণে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকলেই জন্ম মৃত্যুর ন্যায় এক সাধারণ কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা আত্মদর্শণ বা ভগবল্লাভ করিতে পারিবে ও তাহা হইলে মনুষ্য জগত্‌কে আর ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও উপাসনায় বিরত হইতে হইত না। প্রাণকর্ম্ম লিখিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না, সুতরাং প্রাণকর্ম্মকারী পুরুষের বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতেই হইবে। প্রাণকর্ম্ম, আত্মদর্শণ বা ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে যতই বিস্তৃত ব্যাখা বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া যাক্‌ না কেন, তাহাতে কতক গুলি কথা বা প্রমাণ শিক্ষা ভিন্ন কাহারও অনুভবসিদ্ধজ্ঞান জন্মিবে না অথবা কোনরূপ ধারণা হইবে না। প্রাণকর্ম্মের ভিতরেই প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—পঞ্চপ্রাণ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,

ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ; ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না তিন নাড়ী; মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয় চক্র; তদনন্তর সমাধিতে বা যোগ সিদ্ধিতে সহস্রারে অবস্থিতি। কাজেই ঐ সকল সাধারণ বুদ্ধি ও মনের অগোচর বিষয়ের বৃথা আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিতে আবশ্যক নাই। তবুও প্রাণকর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে হইলে, সকল মনুষ্যের সর্ব্ববর্ণের সুখসেব্য সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়েকটি শ্লোক পড়িলেই প্রাণকর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়;—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরং॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥
শোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্য সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্‌ বিষয়াণ্যন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্ম সংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান দীপিতে॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধ্বা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃসদা মুক্ত এব সঃ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম্ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং,
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন,
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্,
সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥"

পূর্ব্বোক্ত সাধন সিদ্ধিতে কোন বর্ণের বা জাতিরই, কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই বাদানুবাদ করিবার কিছুই নাই, কেবল মাত্র এক মন্ত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, শুদ্ধ ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির সাধনে ভিন্ন অন্য কোন জাতির সাধনে বা উপাসনায় মন্ত্রের ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই ভগবান্‌কে স্তব স্তুতি দ্বারা ডাকিয়া থাকে এবং ভারতের বর্ত্তমান আর্য্যজাতির ভিতরে ও সাধারণতঃ স্তোত্রাদি বা ধ্যানাদি পাঠ রূপ উপাসনায় বিধান আছে, কেবল মাত্র আত্মক্রিয়াকারী যোগীগণই স্তব স্তুতি ছাড়িয়া দিয়া ক্রিয়াযোগে মন্ত্রদ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। এই মন্ত্রের অর্থ কি, মন্ত্রের ভিতরে কি আছে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাধারণভাবে বুঝিলে—মন্ত্রকে সাঙ্কেতিক নাম বা উপাসনাবাক্য মনে হয়, অথচ শাস্ত্রে কোথাও সে ভাবে নির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্বোক্ত গীতাশ্লোকের ভিতর

যে প্রণবজপের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই প্রণবের অর্থও এক্ষণে নানা গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। যাই হউক প্রণব বা মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় তবে প্রণবমন্ত্রের উল্লেখের কারণ,—আত্মক্রীয়ায় প্রণব জপ শ্রীভগবান কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং প্রণব বা মন্ত্রের ভিতরে যে কিছু গুপ্ত রহস্য বা পদার্থ আছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই এবং শাস্ত্রে প্রণবের রূপের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই গুপ্ত রহস্যের অনুভূতি বিনা সাধনে, বিনা সিদ্ধিতে হইবার নয়। কর্ম্ম ভূমিতে সকলেই কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে, "দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং" বাস্তবিক সত্যবাক্য হইলে ও দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে কোন মনুষ্যের মুহূর্ত্তের জন্য কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা নয়। 'দৈব' বলিতে, ভগবানের অখণ্ডনীয় নিয়ম, এবং 'কর্ম্ম' বলিতে জ্ঞান বিচার পূর্ব্বক নিয়ত সেই অখণ্ডনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তণ করা। আত্মানুসন্ধান করিতে হইলে, অগ্রে আত্মকর্ম্মের সাধন, কর্ম্মের পরিসমাপ্তিতে বা সাধনের সিদ্ধিতে আত্মদর্শণ বা সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্পূর্ণ।